হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড

دليل الحاج والمعتمر وزائر المسجد النبوي الشريف

গবেষণা
ড. মনজুরে এলাহী
আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
নোমান আবুল বাশার
কাউসার বিন খালেদ
ইকবাল হোসাইন মাসুম
আবুল কালাম আজাদ
জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের
মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান

শব্দরূপ
মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

2011 - 1432

সূচিপত্র

পূর্বকথা

প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে পবিত্র কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের নির্দেশ পেলেন ইব্রাহীম (ﷺ)। নির্মাণ শেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে হজে আসার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা উচ্চারণ করারও আদেশ পেলেন তিনি। নির্দেশ মতো ঘোষণা উচ্চারণ করলেন ইব্রাহীম (ﷺ)। সে ইব্রাহীমি ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বর্তমানে বিশ লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান প্রতি বছর পবিত্র নগরী মক্কায় গমন করে থাকে হজ পালনের উদ্দেশ্যে।

হজ, হাতে-গোনা নির্ধারিত কয়েকটি দিনে পালিত হওয়ার বিষয় হলেও, একজন মানুষের জীবনকে ঢেলে সাজাতে সাহায্য করে নতুন করে। কেউ যখন হজ পালনের উদ্দেশ্যে ঘরসংসার ছেড়ে রওয়ানা হয় মক্কার পথে। মনে মনে সে ভাবতে লাগে যে আত্মীয়-পরিজন, জীবনের মায়া-মোহ, নিত্যদিনের ব্যস্ততা-দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির শেকল ছিঁড়ে সে কেবলই ধাবমান হচ্ছে আল্লাহর পানে। নিজের একান্ত পরিচিত জীবন থেকে আলাদা হয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে সে আল্লাহর জিকির-স্মরণের ভিন্নতর এক জগতে। সে নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে আছে 'বায়তুল্লাহ' আল্লাহর ঘর। যেখানে আছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাদের ত্যাগ ও অর্জনের সোনালি ইতিহাস। যেখানে আছে ওইসব মানুষের ত্যাগের ইতিহাস যাদের প্রতিটি নিশ্বাসে প্রবাহ পেয়েছে আল্লাহর স্মরণ-ভক্তি-ভালোবাসা। যাদের জীবন-মৃত্যু নিবেদিত হয়েছে

...দিত হয় যে, এমন এক পবিত্র

...ায়েত প্রকাশের জায়গা হিসেবে।

এভাবে হজের সফর মানুষের হৃদয়ে শুরু থেকেই সৃষ্টি করে আল্লাহ-মুখী এক পবিত্র চেতনা যা হজের প্রতিটি কাজকে করে দেয় ইখলাসপূর্ণ।

হজ এক অর্থে আল্লাহর পানে সফর। হজে আল্লাহর রহমত-বরকত স্পর্শের এক উন্নততর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে একজন মানুষ। হজ এমন একটি ইবাদত যেখানে একত্রিত হয় আল্লাহর জিকির, শরীরের ক্লেশ-ক্লান্তি-শ্রম। যেখানে ব্যয় হয় উপার্জিত অর্থ। সে হিসেবে হজকে অন্যান্য ইবাদতের নির্যাস বললেও ভুল হবার কথা নয়।

মাবরুর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয় বলে হাদিসে এসেছে। শরিয়তের সীমা-লঙ্ঘন ও অশালীন আচরণমুক্ত হজকারী নবজাতক শিশুর তুল্য হয়ে ফিরে আসে স্বদেশে, এ কথাও ব্যক্ত হয়েছে হাদিসে স্পষ্ট ভাষায়। তবে এ ধরনের হজ কেবল পবিত্র ভূমি পর্যটন করে চলে এলেই হবে না, বরং তার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি হজকর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ-অনুকরণ-ইত্তেবা। হজপালনের প্রতিটি পদক্ষেপে কীভাবে আমরা প্রিয় নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি সে প্রেরণা থেকেই এই পুস্তক রচনায় হাত দেয়া।

বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন ও শরীয়তবিদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল এই পুস্তক। পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকা-টিপ্পনি সরবরাহ করে বইটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি হজকর্মের পেছনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাদের (رضي الله عنهم) আদর্শ কী, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে যথেষ্ট শ্রম দিয়ে। আমাদের দেশে হজ বিষয়ক প্রকাশনা অঢেল। তবে এর অধিকাংশই রেফারেন্সবিহীন। আবার কিছু কিছু এমনও রয়েছে

...ানের অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে

...কর সমাদর পাবে বলে বিশ্বাস।

গবেষকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসার দাবি রাখে। হুজ্জাজ চেরিট্যাবল সোসাইটি ও ইসলামহাউস ডট কম বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁদের সবার প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ ও দোয়া। নোমান বিন আবুল বাশার, কাউসার বিন খালেদ ও আহমদুল্লাহ বিন আহসানুল্লাহ বইটির পরিমার্জন ও সৌন্দর্য বর্দ্ধনে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে আকুতি তিনি যেন আমাদের এই মেহনত-শ্রম কবুল করেন ও পরকালে আমাদের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক
চেয়ারম্যান

হজের ফজিলত ও তাৎপর্য

মাবরুর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।[১] যে হজ করল ও শরিয়ত অনুমতি দেয় না এমন কাজ থেকে বিরত রইল, যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃ-গর্ভ হতে ভূমিষ্ট 'হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে ফিরে এল।[২] 'আরাফার দিন এতো সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য কোনো দিন দেন না। এদিন আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তী হন ও আরাফার ময়দানে অবস্থানরত হাজিদেরকে নিয়ে তিনি ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন, ও বলেন 'ওরা কী চায়?।'[৩]

সর্বোত্তম আমল কী এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বললেন, 'অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান, ও তারপর মাবরুর হজ যা সকল আমল থেকে শ্রেষ্ঠ। সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক তারই মত।'[৪] অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'উত্তম আমল কি এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। বলা হল, 'তারপর কী'? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। বলা হল তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাবরুর হজ।[৫] একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করে আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদে ও অভিযানে যাব না? তিনি বললেন, 'তোমাদের জন্য উত্তম ও সুন্দরতম জিহাদ হল 'হজ', তথা মাবরুর হজ।"[৬] 'হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর অফদ-মেহমান। তারা যদি আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা যদি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন।'[৭] আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'এক উমরা হতে অন্য উমরা, এ দুয়ের মাঝে যা কিছু (পাপ) ঘটবে তার জন্য কাফফারা। আর মাবরুর হজের বিনিময় জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।"[৮] হাদিসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'কারো ইসলাম-গ্রহণ পূর্বকৃত সকল পাপকে মুছে দেয়। হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয়, ও হজ তার পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয়।[৯] ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, 'তোমরা পর পর হজ ও উমরা আদায় করো। কেননা তা দারিদ্র্য ও পাপকে সরিয়ে দেয় যেমন সরিয়ে দেয় কামারের হাপর লোহা-স্বর্ণ-রুপার ময়লাকে। আর হজ্জে মাবরুরের ছোয়াব তো জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।[১০]

উপরে উল্লেখিত হাদিসসমূহের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই হজ পালনেচ্ছু প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত পবিত্র হজের এই ফজিলতসমূহ ভরপুরভাবে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাওয়া। হজ কবুল হওয়ার সকল শর্ত পূর্ণ করে সমস্ত পাপ ও গুনাহ থেকে মুক্ত থেকে কঠিনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।

হজের তাৎপর্য

ইসলামি ইবাদতসমূহের মধ্যে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। এক হাদিস অনুযায়ী হজকে বরং সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে।[১১] তবে হজের এ গুরুত্ব বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠান থেকে বেশি সম্পর্কযুক্ত হজের রুহ বা হাকীকতের সাথে। হজের এ রুহ বা হাকীকত নিম্নবর্ণিত পয়েন্টসমূহ থেকে অনুধাবন করা সম্ভব–

১. এহরামের কাপড় গায়ে জড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে হজের সফরে রওয়ানা হওয়া কাফন পরে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে আখেরাতের পথে রওয়ানা হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২. হজের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া আখেরাতের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজনয়ীতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

[১] - والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (বোখারি : হাদিস নং ১৬৫০)

[২] -فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه من حج لله (বোখারি: হাদিস নং ১৪২৪)

[৩] -মুসলিম : ২/৯৮৩

[৪] - عن ماعز التميمي – رضى الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله وحده ، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال ، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها (আহমদ : ৪/৩৪২)

[৫] - سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال جهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور (বোখারি : ১৪২২)

[৬] - عن عائشة أم المؤمنين – رضى الله عنها – قالت : قلت يارسول الله ، ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال : لَكُنَّ أفضل الجهاد وأجمله الحج ، حج مبرور (বোখারির ব্যাখ্যা ফাতহুল বারি : ৪/১৮৬১)

[৭] - عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله قال : الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم وان استغفروه غفر لهم ইবনে মাযাহ : হাদিস নং ২৮৮৩)

[৮] -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ،، (বোখারি : হাদিস নং ১৬৫০)

[৯] - إن الإسلام يهدم ما كان قبله ، و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله ،، (মুসলিম : হাদিস নং১৭৩)

[১০] - تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة (আলবানি : সহিহুন্নাসায়ি : ২/৫৫৮)

[১১] -দেখুন : বোখারি : হাদিস নং ২৫

৩. এহরাম পরিধান করে পুত-পবিত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য 'লাব্বাইক' বলা সমস্ত গুনাহ-পাপ থেকে পবিত্র হয়ে পরকালে আল্লাহর কাছে হাজিরা দেয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে এহরামের কাপড়ের মতো স্বচ্ছ-সাদা হৃদয় নিয়েই আল্লাহর দরবারে যেতে হবে।

৪. 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে বান্দা হজ বিষয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর যে কোনো ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকার কথা ঘোষণা দেয়। এবং বাধাবিঘ্ন বিপদ-আপদ কষ্ট-যাতনা পেরিয়ে যে কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ কথা ব্যক্ত করে।

৫. এহরাম অবস্থায় সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলা স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে মুমিনের জীবন বল্গাহীন নয়। মুমিনের জীবন আল্লাহর রশিতে বাঁধা। আল্লাহ যেদিকে টান দেন সে সেদিকে যেতে প্রস্তুত। এমনকী যদি তিনি স্বাভাবিক পোশাক-আশাক থেকে বারণ করেন, প্রসাধনী আতর স্নো ব্যবহার, স্বামী-স্ত্রীর সাথে বিনোদন নিষেধ করে দেন, তবে সে তৎক্ষণাৎ বিরত হয়ে যায় এসব থেকে। আল্লাহর ইচ্ছার সামনে বৈধ এমনকী অতি প্রয়োজনীয় জিনিসকেও ছেড়ে দিতে সে ইতস্তত বোধ করে না বিন্দুমাত্র।

৬. এহরাম অবস্থায় ঝগড়া করা নিষেধ। এর অর্থ মুমিন ঝগড়াটে মেজাজের হয় না। মুমিন ক্ষমা ও ধৈর্যের উদাহরণ স্থাপন করে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে। মুমিন শান্তিপ্রিয়। ঝগড়া-বিবাদের ঊর্ধ্বে উঠে সে পবিত্র ও সহনশীল জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

৭. বায়তুল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে মুমিন নিরাপত্তা অনুভব করে। কেননা বায়তুল্লাহকে নিরাপত্তার নিদর্শন হিসেবে স্থাপন করেছেন আল্লাহ তা'আলা।[১] সফরের কষ্ট-যাতনা সহ্য করে বায়তুল্লাহর আশ্রয়ে গিয়ে মুমিন অনুভব করে এক অকল্পিত নিরাপত্তা। তদ্রূপভাবে শিরকমুক্ত ঈমানি জীবযাপনের দীর্ঘ চেষ্টা-সাধনার পর মুমিন আল্লাহর কাছে গিয়ে যে নিরাপত্তা পাবে তার প্রাথমিক উদাহরণ এটি।[২]

৮. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ মুমিনের হৃদয়ে সুন্নতের তাজিম-সম্মান বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি করে। কেননা নিছক পাথরকে চুম্বন করার মাহাত্ব কী তা আমাদের বুঝের আওতার বাইরে। তবুও আমরা চুম্বন করি, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেছেন। বুঝে আসুক না আসুক কেবল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণের জন্যই আমরা চুম্বন করে থাকি হাজরে আসওয়াদ। এ চুম্বন বিনা-শর্তে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আনুগত্যে নিজেকে আরোপিত করার একটি আলামত। ওমর (رضي الله عنه) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার পূর্বে বলেছেন, 'আমি জানি নিশ্চয়ই তুমি একটি পাথর। ক্ষতি-উপকার কোনোটারই তোমার ক্ষমতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[৩] হাজরে আসওয়াদের চুম্বন, তাই, যুক্তির পেছনে না ঘুরে, আল্লাহ ও রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্যের চেতনা শেখায় যা ধর্মীয় নীতি-আদর্শের আওতায় জীবনযাপনকে করে দেয় সহজ, সাবলীল।

৯. তাওয়াফ আল্লাহ-কেন্দ্রিক জীবনের নিরন্তর সাধনাকে বুঝায়। অর্থাৎ একজন মুমিনের জীবন আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এক আল্লাহকে সকল কাজের কেন্দ্র বানিয়ে যাপিত হয় মুমিনের সমগ্র জীবন। বায়তুল্লাহর চার পাশে ঘোরা আল্লাহর মহান নিদর্শনের চার পাশে ঘোরা। তাওহীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চার পাশে ঘোরা। তাওহীদনির্ভর জীবনযাপনের গভীর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা। আর সাত চক্কর চূড়ান্ত পর্যায়কে বুঝায়। অর্থাৎ মুমিন তার জীবনের একাংশ তাওহীদের চার পাশে ঘূর্ণায়মান রাখবে আর বাকি অংশ ঘোরাবে অন্য মেরুকে কেন্দ্র করে, এরূপ নয়। মুমিনের শরীর ও আত্মা, অন্তর-বহির সমগ্রটাই ঘোরে একমাত্র আল্লাহকে কেন্দ্র করে যা পবিত্র কুরআনে 'পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো'[৪] বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

১০. আল্লাহ তা'আলা নারীকে করেছেন সম্মানিতা। সাফা মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর, আল্লাহর রহমত-মদদ কামনায় একজন নারীর সীমাহীন মেহনত, দৌড়ঝাঁপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যে শ্রম-মেহনতের পর প্রবাহ পেয়েছিল রহমতের ফোয়ারা 'যমযম'। সাত চক্করে সম্পূর্ণ করতে হয় সাঈ যা, স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহর রহমত-সাহায্য পেতে হলে সাত চক্কর অর্থাৎ প্রচুর চেষ্টা মেহনতের প্রয়োজন রয়েছে। মা হাজেরার মতো গুটি গুটি পাথর বিছানো পথে সাফা থেকে মারওয়া, মারওয়া থেকে সাফায় দৌড়ঝাঁপের প্রয়োজন আছে। পাথুরে পথে সাত চক্কর, তথা প্রচুর মেহনত ব্যতীত দুনিয়া- আখেরাতের কোনো কিছুই লাভ হবার মতো নয় এ বিধানটি আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় পরিষ্কারভাবে।

১১. উকুফে আরাফা কিয়ামতের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হবে সুবিস্তৃত এক ময়দানে। যেখানে বস্ত্রহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে গুণতে হবে অপেক্ষার প্রহর। সঠিক ঈমান ও আমলের অধিকারী

---

[১] - وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا (সূরা আল বাকারা : ১২৫)

[২] - الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ(الأنعام:٨١) অর্থাৎ যারা ঈমান আনল, ও তাদের ঈমানকে মিশ্রিত করলনা শিরক-জুলুমের সাথে তাদের জন্য আছে নিরাপত্তা এবং তারাই হল পথপ্রাপ্ত।

[৩] - إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (বোখারি : হাদিস নং ১৫২০)

[৪] - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (সূরা আলা বাকারা : ২০৮)

ব্যক্তিরা পার পেয়ে যাবে আল্লাহর করুণায়। আর ইমানহীন-ত্রুটিপূর্ণ ঈমান ও আমলওয়ালা ব্যক্তিদেরকে অনন্ত আযাব ভোগ করাতে শেকল পরিয়ে ধেয়ে নেয়া হবে জাহান্নামের পথে।

হজকর্মসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

তাওয়াফ

পবিত্র কুরআনে এসেছে : এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে (ﷺ) দায়িত্ব দিলাম যে তোমরা আমার ঘর পবিত্র করো তাওয়াফকারী ও ইতিকাফকারীদের জন্য।[১] এ আয়াত থেকে বুঝা যায় তাওয়াফ কাবা নির্মাণের পর থেকেই শুরু হয়েছে।

রামল

রামল শুরু হয় সপ্তম হিজরীতে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ষষ্ঠ 'হিজরীতে হুদায়বিয়া থেকে ফিরে যান উমরা আদায় না করেই। হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী বছর তিনি ফিরে আসেন উমরা পালনের উদ্দেশ্যে। সময়টি ছিল যিলকদ মাস। সাহাবাদের কেউ কেউ জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন এ বছর। তাই মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, 'এমন এক সম্প্রদায় তোমাদের কাছে আসছে য়াছরিবের (মদিনার) জ্বর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে।[২] শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবাদেরকে (রা.) রামল অর্থাৎ আমাদের যুগের সামরিক বাহিনীর কায়দায় ছোট ছোট কদমে গা হেলিয়ে বুক টান করে দৌড়াতে বললেন। উদ্দেশ্য, মুমিন কখনো দুর্বল হয় না এ কথা মুশরিকদেরকে বুঝিয়ে দেয়া। একই উদ্দেশ্যে রামলের সাথে সাথে ইযতিবা অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নীচে রেখে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখারও নির্দেশ করলেন তিনি। সেই থেকে রমল ও ইযতিবার বিধান চালু হয়েছে।

যমযমের পানি ও সাফা মারওয়ার সাঈ

ইবনে আব্বাস (রা.) এর এক বর্ণনায় এসেছে, 'ইব্রাহীম (আ.) হাজি ও তাঁর দুগ্ধপায়ী সন্তান ইসমাইলকে নিয়ে এলেন ও বায়তুল্লাহর কাছে যমযমের উপর একটি গাছের কাছে রেখে দিলেন। মক্কায় সে সময় মানুষ বলতে অন্য কেউ ছিল না। পানিরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না তখন সেখানে। এক পাত্রে খেজুর ও অন্যটিতে পানি রেখে ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন ইব্রাহীম (আ.)। ইসমাইল (আ.) এর মা তার পিছু নিলেন। বললেন, এই জনমানবশূন্য তৃণ-লতা-হীন ভূমিতে আমাদেরকে ছেড়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি একাধিকবার ইব্রাহীম (আ.) কে কথাটা বললেন। ইব্রাহীম তার দিকে না তাকিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ করেছেন? হাঁ, ইব্রাহীম (আ.) উত্তর করলেন। তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। হাজি ফিরে এলেন। ইব্রাহীম এগিয়ে চললেন। তিনি যখন দু'পাহাড়ের মধ্য খানে সরু পথে প্রবেশ করলেন, যেখানে কেউ তাঁকে দেখছে না, তিনি বায়তুল্লাহর পানে মুখ করে দাঁড়ালেন! হাত উঠিয়ে এই বলে দোয়া করলেন, **'হে আল্লাহ! আমি আমার বংশধরকে শস্যবিহীন এক উপত্যকায় বসবাস করতে রেখে দিলাম, তোমার পবিত্র ঘরের সন্নিকটে। হে আল্লাহ যাতে তারা সালাত কায়েম করে। অতঃপর মানুষের হৃদয় তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও, এবং তাদের রিজিক দাও ফলের, হয়তো তারা শুকরিয়া আদায় করবে।**[৩] ইসমাইল (আ.) এর মা তাকে দুধ পান করাতে থাকলেন। নিজে ওই পানি থেকে পান করে গেলেন। পাত্রের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি পিপাসার্ত হলেন। পিপাসা পেল সন্তানকেও। সন্তানকে তিনি তেষ্টায় কাতরাতে দেখে সরে গেলেন দূরে যাতে এ অবস্থায় সন্তানকে দেখে কষ্ট পেতে না হয়। পাহাড়সমূহের মধ্যে সাফাকে তিনি পেলেন সবচেয়ে কাছে। তিনি সাফায় আরোহণ করে কাউকে দেখা যায় কি-না জানার জন্য উপত্যকার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। কাউকে দেখতে না পেয়ে সাফা থেকে নেমে এলেন। উপত্যকায় পৌঁছালে তিনি তাঁর কামিজ টেনে ধরে পরিশ্রান্ত ব্যক্তির মতো দ্রুত চললেন। উপত্যকা অতিক্রম করলেন। অতঃপর মারওয়ায় আরোহণ করলেন। মারওয়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি-না। কাউকে দেখতে না পেয়ে নেমে এলেন মারওয়া থেকে। আর এ ভাবেই দু'পাহাড়ের মাঝে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এটাই হল সাফা মারওয়ার মাঝে মানুষের সাঈ (করার কারণ)। তিনি মারওয়ার ওপর থাকাকালে একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে নিজেকে করে বললেন, 'থামো!' তিনি আবারও আওয়াজটি শুনতে পেয়ে বললেন– শুনতে পেয়েছি, তবে তোমার

---

[১] وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (সূরা আল বাকারা : ১২৫)

[২] – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة .. وفـــــــي رواية زيادة : ارملوا ليرى المشركون قوتكم بخاري : ١٦٠٢ ومسلم : ١٢٦٢.

[৩] -সূরা ইব্রাহীম : ৩৭

কাছে কোনো ত্রাণ আছে কি না তাই বলো। তিনি দেখলেন, যমযমের জায়গায় একজন ফেরেশতা তাঁর পায়ের গোড়ালি বা পাখা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। এক পর্যায়ে পানি বের হয়ে এল, তিনি হাউজের মতো করে পানি আটকাতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ ইসমাইলের মাতার ওপর রহম করুন। তিনি যমযমকে ছেড়ে দিলে, বর্ণনান্তরে-যমযমের পানি না ওঠালে, যমযম একটি চলমান ঝরনায় পরিণত হত।

ফেরেশতা হাজেরাকে বললেন, হারিয়ে যাওয়ার ভয় করো না, কেননা এখানে বায়তুল্লাহ, যা নির্মাণ করবে এই ছেলে ও তার পিতা। আর আল্লাহ তার আহালকে ধ্বংস করেন না।[১]

উকুফে আরাফা

আমরা সুনির্দিষ্ট স্থানের বাইরে উকুফে আরাফা করছিলাম। ইবনে মেরবা আনসারি আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, আমি আপনাদের কাছে রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি বলেছেন: হজের মাশায়ের—জায়গায় অবস্থান করুন—কেননা আপনারা আপনাদের পিতা ইব্রাহীমের ঐতিহ্যের ওপর রয়েছেন।[২] এর অর্থ ইব্রাহীম (ﷺ) উকুফে আরাফা করেছিলেন, সে হিসেবে আমরাও করে থাকি।

[১] ঘটনাটি বিস্তারিত দেখুন সহিহ বোখারি : ১/৪৭৪-৪৭৫

[২]- আবু দাউদ ও তিরমিযি : হাদিস নং (৮৮৩) আলবানি এ হাদিসটিকে সহিহু আবি দাউদ গ্রন্থে বিশুদ্ধ বলেছেন (হাদিস নং ১৬৮৮)

হজ পালনের পবিত্র স্থানসমূহের পরিচিতি

পবিত্র কাবা

১৪১৭ হিজরীতে বাদশা ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজীজ সংস্কার করেন পবিত্র কাবা ঘর। ৩৭৫ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১০৪০ হিজরীতে সুলতান মারদান আল উসমানির সংস্কারের পর এটাই হল ব্যাপক সংস্কার। বাদশা ফাহাদের সংস্কারের পূর্বে পবিত্র কাবাকে আরও ১১ বার নির্মাণ পুনর্নির্মাণ সংস্কার করা হয়েছে বলে কারও কারও দাবি। নীচে নির্মাতা, পুন:নির্মাতা, ও সংস্কারকের নাম উল্লেখ করা হল-

১. ফেরেশতা। ২. আদম।. ৩. শীশ ইবনে আদম। ৪.ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আ) ৫. আমালেকা সম্প্রদায়। ৬. জুরহুম গোত্র। ৭.কুসাই ইবনে কিলাব। ৮ .কুরাইশ। ৯.আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (رضي الله عنه) [৬৫ হি.] ১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ [৭৪ হি.] ১১. সুলতান মারদান আল-উসমানী [১০৪০ হি.] বাদশা ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজীজ [১৪১৭ হি.][১]

পবিত্র কাবার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ

উচ্চতা	মুলতাযামের দিকে দৈর্ঘ্য	হাতিমের দিকে দৈর্ঘ্য	রুকনে য়ামানি ও হাতিমের মাঝখানকার দৈর্ঘ্য	হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামানির মাঝখানকার দৈর্ঘ্য
১৪ মিটার	১২.৮৪ মিটার	১১.২৮ মিটার	১২.১১ মিটার	১১.৫২ মিটার

হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)

পবিত্র কাবার দক্ষিণ কোণে, জমিন থেকে ১.১০ মিটার উচ্চতায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত। হাজরে আসওয়াদ দীর্ঘে ২৫ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১৭ সেন্টিমিটার। শুরুতে হাজরে আসওয়াদ একটুকরো ছিল, কারামিতা সম্প্রদায় ৩১৯ হিজরীতে পাথরটি উঠিয়ে নিজেদের অঞ্চলে নিয়ে যায়। সেসময় পাথরটি ভেঙে ৮ টুকরায় পরিণত হয়। এ টুকরোগুলোর সবচেয়ে বড়োটি খেজুরের মতো। টুকরোগুলো বর্তমানে অন্য আরেকটি পাথরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যার চার পাশে দেয়া হয়েছে রুপার বর্ডার। রুপার বর্ডারবিশিষ্ট পাথরটি চুম্বন নয় বরং তাতে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদের টুকরোগুলো চুম্বন বা স্পর্শ করতে পারলেই কেবল হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ করা হয়েছে বলে ধরা হবে।

হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে নেমে-আসা একটি পাথর[২] যার রং শুরুতে—এক হাদিস অনুযায়ী—দুধের বা বরফের চেয়েও সাদা ছিল। পরে আদম-সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দেয়।[৩] হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়।[৪] হাজরে আসওয়াদের একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট রয়েছে, যে ব্যক্তি তাকে চুম্বন-স্পর্শ করল, তার পক্ষে সে কিয়ামতের দিন সাক্ষী দেবে।[৫] তবে হাজরে আসওয়াদ কেবলই একটি পাথর যা কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ কোনোটাই করতে পারে না।[৬]

রুকনে য়ামানি

কাবা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। তাওয়াফের সময় এ কোণকে সুযোগ পেলে স্পর্শ করতে হয়। চুম্বন করা নিষেধ। হাদিসে এসেছে, ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দুই রুকনে য়ামানি ব্যতীত অন্য কোনো জায়গায় স্পর্শ করতে দেখিনি।[৭]

---

[১] -ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আব্দুল গনী : তারিখু মাক্কাল মুকাররামা, পৃ : ৩৪ , মাতাবিউর রাশীদ, মদিনা মুনাওয়ারা

[২] - الحجر الأسود من الجنة (নাসায়ি : ৫/২২৬ , আলাবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন: সহিহু সুনানিন নাসায়ি : ২৭৪৮)

[৩] - نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم (তিরমিযি : হজ অধ্যায় (৮৭৭) وفي رواية أشد بياضا من الثلج (ইবনু খুজায়মা : ৪/২৮২)

[৪] - إن مسحهما يحطان الخطايا حطا (নাসায়ি :৫/২২১; আলাবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, নং ২৭৩২)

[৫] - إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق(আহমদ: ১/২৬৬; আলবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (দ্রঃ সহিহ ইবনে মাযাহ, নং ২৩৮১)

[৬] - ওমর (র) বলেছেন, إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع – আমি নিশ্চয়ই জানি তুমি কল্যাণ অকল্যান কোনোটাই করতে পার না। (বোখারি : ৩/৪৬২)

[৭] -لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين (মুসলিম :২/৯২৪)

মুলতাযাম

হাজরে আসওয়াদ থেকে কাবা শরীফের দরজা পর্যন্ত জায়গাটুকুকে মুলতাযাম বলে।[১] মুলতাযাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ এঁটে থাকার জায়গা' সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় এসে মুলতাযামে যেতেন ও দু'হাতের তালু, দু'হাত, ও চেহারা ও বক্ষ রেখে দোয়া করতেন। বিদায়ি তাওয়াফের পূর্বে বা পরে অথবা অন্য যে কোনো সময় মুলতাযামে গিয়ে দোয়া করা যায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন—

إن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو، ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك وله أن يفعل قبل طواف الوداع ، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره ، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة

—যদি মুলতাযামে আসার ইচ্ছা করে— মুলতাযাম হল হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থান— অতঃপর সেখানে তার বক্ষ, চেহারা, দুই বাহু ও দুই হাত রাখে ও দোয়া করে, আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজনগুলো সওয়াল করে তবে এরূপ করার অনুমতি আছে। বিদায়ি তাওয়াফের পূর্বেও এরূপ করতে পারবে। মুলতাযাম ধরার ক্ষেত্রে বিদায়ি অবস্থা ও অন্যান্য অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর সাহাবগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন এরূপ করতেন।[২] তবে বর্তমান যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে মুলতাযামে ফিরে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই সুযোগ পেলে যাবেন অন্যথায় যাওয়ার দরকার নেই। কেননা মুলতাযামে যাওয়া তাওয়াফের অংশ নয়।

মাকামে ইব্রাহীম

মাকাম শব্দের আভিধানিক অর্থ, দণ্ডায়মান ব্যক্তির পা রাখার জায়গা। আর মাকামে ইব্রাহীম বলতে সেই পাথরকে বুঝায় যেটা কাবা শরীফ নির্মাণের সময় ইসমাইল নিয়ে এসেছিলেন যাতে পিতা ইব্রাহীম এর ওপর দাঁড়িয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করতে পারেন। ইসমাইল (ﷺ) পাথর এনে দিতেন, এবং ইব্রাহীম (ﷺ) তাঁর পবিত্র হাতে তা কাবার দেয়ালে রাখতেন। উর্ধ্বে উঠার প্রয়োজন হলে পাথরটি অলৌকিকভাবে ওপরের দিকে উঠে যেত।[৩] তাফসীরে তাবারিতে সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে—

يه علامات بينات من قدرة الله ، وآثار خليله ابراهيم ،منهن أثر قدم خليله ابراهيم في الحجر الذي قام عليه .

—বায়তুল্লায় আল্লাহর কুদরতের পরিষ্কার নিদর্শন রয়েছে এবং খলিলুল্লাহ ইব্রাহীম (ﷺ) এর নিদর্শনাবলী রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল তাঁর খলিল ইব্রাহীম (ﷺ) পদচিহ্ন ওই পাথরে যার ওপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।[৪]

ইব্রাহীম (ﷺ) এর পদচিহ্নের একটি ১০ সেন্টিমিটার গভীর, ও অন্যটি ৯ সেন্টিমিটার। লম্বায় প্রতিটি পা ২২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১১ সেন্টিমিটার।

বর্তমানে এক মিলিয়ন রিয়েল ব্যয় করে মাকামের বক্সটি নির্মাণ করা হয়েছে। পিতল ও ১০ মিলি মিটার পুরো গ্লাস দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এটি। ভেতরের জালে সোনা চড়ানো। হাজরে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইব্রাহীমের দূরত্ব হল ১৪.৫ মিটার।[৫]

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করতে হয়। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় করলে সালাত হয়ে যায়।

মাতাফ

কাবা শরীফের চার পাশে উন্মুক্ত জায়গাকে মাতাফ বলে। মাতাফ শব্দের অর্থ, তাওয়াফ করার জায়গা। মাতাফ সর্বপ্রথম পাকা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, কাবার চার পাশে প্রায় ৫ মিটারের মত। কালক্রমে মাতাফ সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে শীতল মারবেল পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে মাতাফ যা প্রচণ্ড রোদের তাপেও শীতলতা হারায় না, ফলে হজকারীগণ আরামের সাথে পা রেখে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে পারেন।

সাফা

কাবা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, ১৩০ মিটার দূরে, সাফা পাহাড় অবস্থিত। সাফা একটি ছোট পাহাড় যার উপর বর্তমানে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ পাহাড়ের একাংশ এখনও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। আর বাকি অংশ পাকা করে দেয়া

---

[১] - আল মুসান্নাফ লি আব্দির রাজ্জাক : ৫/৭৩

[২] - শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মজমূউল ফতুওয়া : ২৬/১৪২

[৩] - দেখুন ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আব্দুল গনী : তারিখু মক্কা কাদিমান ওয়া হাদিসান, পৃ: ৭১

[৪] - তাফসীরে তাবারি : ৪/১১

[৫] - দেখুন ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আব্দুল গনী : প্রাগুক্ত , পৃ ৭৫-৭৬

হয়েছে। সমতল থেকে উঁচুতে এই পাকা অংশের ওপরে এলে সাফায় উঠেছেন বলে ধরে নেয়া হবে। সাফা পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এখনও পবিত্র কাবা দেখতে পারা যায়।

মারওয়া

শক্ত সাদা পাথরের ছোট্ট একটি পাহাড়। পবিত্র কাবা থেকে ৩০০ মিটার দূরে পূর্ব- উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমানে মারওয়া থেকে কাবা শরীফ দেখা যায় না। মারওয়ার সামান্য অংশ খোলা রাখা হয়েছে। বাকি অংশ পাকা করে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

মাস'আ

সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে মাস'আ বলা হয়। মাস'আ দীর্ঘে ৩৯৪.৫ মিটার ও প্রস্থে ২০ মিটার। মাসআ'র গ্রাউন্ড ফ্লোর ও প্রথম তলা সুন্দরভাবে সাজানো। গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভিড় হলে প্রথম তলায় গিয়েও সাঈ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে ছাদে গিয়েও সাঈ করা যাবে তবে খেয়াল রাখতে হবে আপনার সাঈ যেন মাসআ'র মধ্যেই হয়। মাসআ থেকে বাইরে দূরে কোথাও সাঈ করলে সাঈ হয় না।

মসজিদুল হারাম

কাবা শরীফ, ও তার চার পাশের মাতাফ, মাতাফের ওপারে বিল্ডিং, বিল্ডিঙের ওপারে মারবেল পাথর বিছানো উন্মুক্ত চত্বর এ সবগুলো মিলে বর্তমান মসজিদুল হারাম গঠিত। কারও কারও মতে পুরা হারাম অঞ্চল মসজিদুল হারাম হিসেবে বিবেচিত। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে এসেছে, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ – **তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।**[১] অর্থাৎ হারাম অঞ্চলে প্রবেশ করবে। সূরা ইসরায় মসজিদুল হারামের কথা উল্লেখ হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴿١﴾

–পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় রাতের বেলায় নিয়ে গেলেন, যার চার পাশ আমি করেছি বরকতময়।[২] ইতিহাসবিদদের মতানুসারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে উম্মে হানীর ঘরের এখান থেকে ইসরা ও মেরাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর তৎকালে কাবা শরীফের চারপাশে সামান্য এলাকা জুড়ে ছিল মসজিদুল হারাম, উম্মে হানীর ঘর মসজিদুল হারাম থেকে ছিল দূরে। তা সত্ত্বেও ওই জায়গাকে মসজিদুল হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১] - সূরা আলফাত্‌হ : ২৭

[২] - সূরা আল ইসরা : ১

হজের প্রস্তুতি

মানসিক প্রস্তুতি

১.প্রথমে আপনার নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন। কেননা নিয়তের ওপরই আমল নির্ভরশীল। হাদিসে এসেছে, 'নিশ্চয়ই নিয়তের ওপর আমল নির্ভরশীল'[১]। তাই লোক-দেখানো, হজ করলে সমাজে মান-মর্যাদা বাড়বে, নামের সাথে আলহাজ্ব লেখা যাবে, নির্বাচনি লড়াইয়ে জনতাকে অধিক পরিমাণে প্রভাবিত করা যাবে ইত্যাদি ভাবনা থেকে নিজেকে পবিত্র করুন। এসব মনোবৃত্তিকে 'রিয়া' বলা হয়। রিয়া মারাত্মক অন্যায় যাকে হাদিসে ছোট শিরক বলা হয়েছে।[২] ছোট শিরক বুকে ধারণ করে হজ করলে হজ কবুল হবে না কথাটি ভালোভাবে স্মরণ রাখুন। তাই রিয়া থেকে মুক্ত থাকুন ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন রিয়া-মুক্ত হজ পালনের তাওফিক দান করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও এরূপ প্রার্থনা করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন,

اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.

-হে আল্লাহ! এমন হজের তাওফিক দাও যা হবে রিয়া ও সুনাম কুড়ানোর মানসিকতা হতে মুক্ত।[৩]

২. যে দিন থেকে হজ পালনের নিয়ত করেছেন সেদিন থেকেই মনে করবেন যে আপনার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। ইতোপূর্বে যদি আপনি আল্লাহর হক নষ্ট করে থাকেন, সালাত, সিয়াম যাকাত আদায় ইত্যাদির কোনোটিতে অবজ্ঞা-অনীহা-অমনোযোগ দেখিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন। হক্কুল্লাহ বিষয়ে সকল জানা-অজানা গুনাহ-পাপ থেকে মুক্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করুন। কাঁদুন। মুক্তিকামনা করুন হৃদয় উজাড় করে, আল্লাহ তালার সীমাহীন রহমত ও ক্ষমাশীল হওয়ার কথা খেয়াল রেখে।

এখন থেকে হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকারের আওতাভুক্ত প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আদায় করুন। বিগত পাপ-অন্যায়ের জন্য তাওবা করুন। তাওবার নিয়ম হল–

ক. সকল প্রকার গুনাহ-পাপ থেকে ফিরে আসা, ও তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা।

খ. পূর্বের সকল পাপ-অন্যায়ের প্রতি অনুশোচনা ব্যক্ত করা।

গ. এমন অপরাধে ভবিষ্যতে আর কখনো জড়াবেন না এমর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া।

৩. অপরাধ যদি হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে তাওবার পূর্বে তা মীমাংসা করে নিতে হবে। ক্ষতিপূরণ দিয়ে হোক বা ক্ষমা চেয়ে হোক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে সমঝতায় আসার পর তাওবা করতে হবে। এর অন্যথা হলে তাওবার দ্বারা কোনো ফল পাওয়া যাবে না। মনে রাখবেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সুরাহা না করলে কিয়ামতের দিন আপনার সমস্ত নেক আমল তার আমল-নামায় লিখে দেয়া হবে। নেক আমলের অনুপস্থিতিতে ওই ব্যক্তির পাপের বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। তাই এবিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। হজ করলেও হক্কুল ইবাদ ক্ষমা হয় না, যতক্ষণ না ক্ষতিপূরণ দিয়ে অথবা ক্ষমা চেয়ে ওই ব্যক্তিকে রাজি-খুশি করা হবে। কাউকে আর কোনো দিন অবৈধভাবে কষ্ট দেবেন না, কারও অর্থ-কড়ি বেহালালভাবে কখনো খাবেন না এই প্রতিজ্ঞা করুন। সাথে সাথে যাদের সাথে আপনি অতীতে অসদাচরণ করেছেন বা যাদের অর্থসম্পদ হারামভাবে আপনার দখলে এসেছে তাদের কাছে ক্ষমা চান। তাদের প্রাপ্য-সম্পদ ফিরিয়ে দিন। তাদের ভালো চেয়ে দোয়া করুন। নিজের অন্যায়ের জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। ইস্তিগফার করুন।

৪. হজ পালন অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ, বাকবিতণ্ডা নিষেধ।[৪] তাই পূর্ব থেকেই আপনার মধ্যে যাতে সহিষ্ণু মেজাজ গড়ে উঠে সে ব্যাপারে মানসিকভাবে

প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। প্রতিজ্ঞা করুন হজের দিনগুলোয় আপনি কোনো অবস্থাতেই কারও সাথে ঝগড়া করবেন না। এমনকী আপনার প্রাপ্য অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত হন তবুও।

৫. সফর একখণ্ড আযাব বলে একটি কথা আছে। অতীতে উট-ঘোড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে সফরের কষ্ট বর্তমান যুগের তুলনায় হাজারগুণ বেশি ছিল, এ কথা ঠিক। তবে বর্তমানে কষ্ট একেবারেই হয় না তা নয়। হজের সফরে তো বরং বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করতে হয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। যেমন আরাফা থেকে মুযদালিফায় আসবেন, বাস আসছে যাচ্ছে কিন্তু

---

[১] -- إنما الأعمال بالنيات (বোখারি : হাদিস নং ১)

[২] - إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك الأصغر ، يارسول الله ؟ قال : الرياء (আহমদ : হাদিস নং ২২৫২৪)

[৩] - ইবনে মাজাহ : ৮৯০

[৪] - وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (সূরা বাকারা : ১৯৭)

ভিড়ের কারণে উঠতে পারছেন না কোনোটাতেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থেকে বাসে উঠার সুযোগ পেলেন কিন্তু থাকতে হল দাঁড়িয়ে, পথে সম্মুখীন হলেন অসম্ভব ভিড়ের। ধরুন আপনার গাড়িটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয়, তাই গরমে, মানুষের ভিড়ে আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমতাবস্থায় ধৈর্যধারণ ব্যতীত আপনার কিছুই করার নেই। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষা, বঞ্চনা, এমনকী ক্ষুধা তৃষ্ণার বর্ণনাতীত কষ্টের সম্মুখীন হতে পারেন। এসব পরিস্থিতির জন্য এখন থেকেই আপনাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। হজের সফর কষ্টের সফর। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার যাতনা একমাত্র আল্লাহর খাতিরে সহ্য করার সফর, তাই আপনি শুরু থেকেই ধৈর্যের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে হজের সফরের জন্য তৈরি হোন।

৬. আল্লাহর জিকির হজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সূরা বাকারার ১৯৮, ২০০, ২০৩ আয়াতে হজে জিকিরের বিষয়ে উল্লেখ হয়েছে। হজের তাওয়াফ-সাঈ কঙ্কর মারার বিধান আল্লাহর জিকির বা স্মরণের উদ্দেশে রাখা হয়েছে বলে হাদিসে এসেছে[১] সে হিসেবে হজের পুরো সময়টা যেন আল্লাহর জিকির ও স্মরণে কাটে, আল্লাহর মেহমানদারিতে থাকা অবস্থায় আল্লাহর ধ্যান, আল্লাহর স্মরণ সদাসর্বদা নিজের হৃদয়কে আন্দোলিত করে রাখে সে জন্য শুরু থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ও চর্চা অনুশীলন করতে হবে। অন্যথায় হঠাৎ করে আল্লাহর জিকির ও স্মরণে নিজেকে আরোপিত করা সম্ভব নয়। এ কারণে হজ পালনের সময় অধিকাংশ হাজিদেরকে জিকির থেকে গাফেল থাকতে দেখা যায়। ঘরসংসার, স্ত্রী-সন্তান, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতে দেখা যায় অনেককে। তাই এ বিষয়ে আগে থেকেই মনোযোগী হোন, ও তাসবীহ-তাহলীল অভ্যাস গড়ে তুলুন।

৭. যে কোনো ইবাদত পালনের সময়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পথ-পদ্ধতি অনুসরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা রাসূলুল্লাহর আদর্শ বাদ দিয়ে নিজের অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি-ধারণা অনুযায়ী খেয়াল-খুশি মত ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি কর্ম যাতে সম্পাদন করতে পারেন, হামদ ও ছানা, দোয়া-প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারেন সে জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন। কোথাও কোনো মাসআলা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ কীভাবে করেছেন সে বিষয়টি তালাশ করে বের করার চেষ্টা করুন। যখন কোনো বিশুদ্ধ হাদিসে আপনার সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন তখন তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। বিশুদ্ধ হাদিসের উদ্ধৃতি ব্যতীত কেউ কিছু বললে তা প্রত্যাখ্যান করুন। মনে রাখবেন, ব্যক্তি কোনো রেফারেন্স নয়। শুধু হজ নয়, অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সত্য।

৮. হজ পালনকালে আবেগতাড়িত হয়ে কোনো কিছু না করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন। কখনো কখনো আবেগ আপনাকে পরাজিত করতে পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকুন। অন্যথায় ছোয়াব নয় বরং গুনাহ নিয়ে আপনি দেশে ফিরতে পারেন। উদাহরণত ধরে নিন আপনি তাওয়াফ করছেন। আবেগতাড়িত মানুষদেরকে দেখতে পেলেন মাকামে ইব্রাহীমকে চুম্বন করছে, টুপি-রুমাল দিয়ে স্পর্শ করছে। আপনিও আবেগতাড়িত হয়ে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে অনুরূপ করে বসলেন। এমতাবস্থায় আপনি ইসলামের আদর্শ-বহির্ভূত একটি কাজ করলেন। যাতে ছোয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে নিঃসন্দেহে। তদ্রূপভাবে মদিনায় রাসূলুল্লাহর রওজায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে ছেলে-সন্তান চাইলেন বা রোগমুক্তি কামনা করলেন এমতাবস্থায় আপনি স্পষ্ট তাওহীদ-বিরোধী একটি কাজ করে বসলেন। তাই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন।

৯. হজের মূল স্লোগান হল তালবিয়া যার মূল বক্তব্যই হোল আল্লাহর লা-শরিকত্ব, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব পরিচালনায় তিনি কাউকে অংশীদার হিসেবে নেননি। বা অংশীদার হবার কারও কোনো যোগ্যতাও নেই। তাই প্রশংসা একমাত্র তারই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার উপযোগী। সে হিসেবে হজ পালনকালে যেন কোনো শিরকের ছোঁয়া আপনার মন-মস্তিষ্কে, চিন্তা-চেতনায় না লাগে সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কেননা শিরক, ব্যক্তির ঈমান-ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়।[২]

১০. হজে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ সমগ্র পৃথিবী থেকে এসে একত্রিত হয়। পুরুষের পাশে নারীদের সমাগম ঘটে সমানভাবে। অধিকাংশ নারী উন্মুক্ত চেহারায় চলাচল করেন, সালাত আদায় করতে আসেন। এদের অনেকেরই রয়েছে নজর-কাড়া রূপ-লাবণ্য। এ ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্ব থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্যথায় ছোয়াবের পরিবর্তে গুনাহ করে হজ থেকে ফিরে আসবেন।

১১. স্বামী-স্ত্রী একসাথে হজ করতে গেলে হজের দিন গুলোতে স্বামী-স্ত্রী সুলভ মেলা-মেশা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হয়। তাই এ বিষয়ে উভয়ে খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নিন এবং মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। অন্যথায় গোটা হজই নষ্ট হয়ে যাবে এ কথা মনে রাখবেন।

---

[১] - إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفاء والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله (আবুদাউদ : হাদিস নং ১৬১২)

[২] - لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (সূরা আয্‌যুমার : ৬৫)

আর্থিক প্রস্তুতি

১. অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থে হজ করতে গেলে তা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। এ ধরনের ব্যক্তি 'লাব্বাইক' বললে আল্লাহ তার লাব্বাইক প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, তোমার কোনো লাব্বাইক নেই, তোমার জন্য সৌভাগ্য বার্তাও নেই। তোমার পাথেয় হারাম, তোমার অর্থ-কড়ি হারাম, তোমার হজ গায়ের-মাবরুর, অগ্রহণযোগ্য।[১] সে হিসেবে হজের প্রাথমিক প্রস্তুতিই হবে হালাল রুজি-রোজগারের মাধ্যমে নিজের ও পরিজনের প্রয়োজন মেটানো ও সম্পূর্ণ হালাল রিজিক-সম্পদ থেকে পাই-পাই করে একত্রিত করা। যদি হালাল রিজিক উপার্জন করে হজে যাওয়ার মতো পয়সা জোগাড় করতে না পারেন তবে আপনার ওপর হজ ফরজ হবে না। হজে আপনাকে যেতেই হবে, কথা এ রকম নয়। বরং ঘরসংসারের জরুরি প্রয়োজন মিটিয়ে হজে যাওয়ার খরচা হাতে আসলে তবেই কেবল হজ ফরজ হয়। তাই কখনো হারাম পয়সায় হজ করার পরিকল্পনা করবেন না। যদি এমন হয় যে আপনার সমগ্র সম্পদই হারাম, তাহলে আপনি তাওবা করুন। হারাম পথ বর্জন করে হালাল পথে সম্পদ উপার্জন শুরু করুন। আর কোনো দিন হারাম পথে যাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করুন। এক পর্যায়ে যখন প্রয়োজনীয় হালাল পয়সা জোগাড় হবে কেবল তখনই হজ করার নিয়ত করুন।

২. আপনার কোনো ঋণ থেকে থাকলে হজ করার পূর্বেই তা পরিশোধ করে দিন। তবে আপনি যদি বড়ো ব্যবসায়ী হন, ঋণ করা যার নিত্যদিনের অভ্যাস বা প্রয়োজন, তাহলে আপনার গোটা ঋণের ব্যাপারে একটা আলাদা অসিয়ত নামা তৈরি করুন। আপনার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার যারা হবেন তাদেরকে এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করে যান।

৩. ব্যালটি বা ননব্যালটি উভয় ক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা আপনাকে চার্জ করা হয় তার থেকেও বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত সঙ্গে নেয়ার চেষ্টা করবেন। পারলে আরো বেশি নেবেন। এ পয়সা প্রয়োজনের সময় ব্যয় করা– যেমন কোনো ভুলের কারণে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দম ওয়াজিব হয়ে যাওয়া—ব্যতীতও সহযাত্রী হাজিদের আপ্যায়ন করা, অভাবী হাজিদেরকে সাহায্য করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যয় করবেন। এমনকি ক্ষুধা-পিপাসা পেলে কার্পণ্য না করে প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ ইত্যাদির জন্য আপনাকে অতিরিক্ত অর্থ হাতে রাখতে হবে। তাছাড়া আত্মীয় স্বজনদের জন্য হাদিয়া তোহফা ক্রয় করাও আপনার কাছে একটি প্রয়োজন বলে মনে হতে পারে সে জন্যও আপনি অতিরিক্ত পয়সা সঙ্গে নিতে পারেন।

৪. পয়সাকড়ি নিরাপদ স্থানে হেফাজত করবেন। কোমরের বেল্টে একসাথে সব পয়সা রাখবেন না। আপনার ব্যাগে অথবা–বিশ্বস্ত হলে– হোটেলের মালিক অথবা মুয়াল্লিমের অফিসে রিসিপ্ট নিয়ে টাকা জমা রাখতে পারেন। মিনা ও আরাফাতেও বেশি টাকা সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। কেননা হজের নাম ধরে কেউ কেউ মানুষের ভিড়ে টাকা হাতিয়ে নেয়ার ধান্দায় থাকে। তাদের খপ্পর থেকে পয়সাকড়ি হেফাজত করুন।

---

[১] - ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور

হজ তিন প্রকার

তামাত্তু ।কেরান ।ইফরাদ

তামাত্তু হজ

শাওয়াল, যিলকদ ও জিলহজ এ তিনটি হল হজের মাস। হজের মাসসমূহে পৃথকভাবে প্রথমে উমরা ও পরে হজ আদায় করাকে তামাত্তু হজ বলে। অর্থাৎ ১ লা শাওয়াল থেকে উকুফে আরাফার পূর্বে (৯ জিলহজ), যেকোনো মুহূর্তে উমরা আদায় করে হালাল হয়ে যাওয়া ও উকুফে আরাফার পূর্বে নতুন করে হজের এহরাম বাঁধা। এবং হজের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা। যারা হাদী সঙ্গে করে মক্কায় গমন করে না—বর্তমানে বহিরাগত হাজিদের কেউই হাদীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসে না—তাদের জন্য তামাত্তু হজই উত্তম। কারও কারও মতে সর্বাবস্থায় তামাত্তু হজ উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজের সময় তাঁর সঙ্গে থাকা সাহাবাদের মধ্যে যারা হাদীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে আসেননি তাদের সবাইকে তামাত্তু করার পরামর্শ দিয়েছেন, এবং নিজেও এই বলে কামনা ব্যক্ত করেছেন যে, যদি এ বিষয়টি পূর্বে প্রতীয়মান হত তাহলে হাদীর জন্তু সঙ্গে আনতাম না, আর যদি হাদী আমার সাথে না থাকত, তবে হালাল হয়ে যেতাম।[১]

তামাত্তু হজ তিনভাবে আদায় করা যায়

ক) মীকাত থেকে উমরার জন্য এহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ সাঈ করে মাথার চুল হলক অথবা কসর করে হালাল হয়ে যাওয়া ও হজ পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করা। ৮ জিলহজ নতুনভাবে হজের এহরাম বেঁধে হজের কার্যক্রম সম্পাদন করা।

খ) মীকাত থেকে উমরার নিয়তে এহরাম বেঁধে মক্কা গমন করা ও উমরার কার্যক্রম—তাওয়াফ, সাঈ হলক-কসর—সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাওয়া। হজের পূর্বেই যিয়ারতে মদিনা সেরে নেয়া ও মদিনা থেকে মক্কায় আসার পথে আবয়ারে আলী নামক জায়গা থেকে উমরার নিয়তে এহরাম বেঁধে মক্কায় আসা। উমরা আদায় করে হালাল হয়ে যাওয়া, ৮ জিলহজ হজের জন্য নতুনভাবে এহরাম বেঁধে হজ আদায় করা।

গ) এহরাম না বেঁধে সরাসরি মদিনা গমন করা। যিয়ারতে মদিনা শেষ করে মক্কায় আসার পথে আবয়ারে আলী নামক জায়গা থেকে উমরার নিয়তে এহরাম বাঁধা ও মক্কায় এসে তাওয়াফ সাঈ হলক-কসর করে হালাল হয়ে যাওয়া, ও ৮ জিলহজ হজের জন্য নতুন করে এহরাম বাঁধা।

কেরান হজ

উমরার সাথে যুক্ত করে একই এহরামে উমরা ও হজ আদায় করাকে কেরান হজ বলে। কেরান হজ দু'ভাবে আদায় করা যায়।

ক) মীকাত থেকে এহরাম বাধার সময় হজ ও উমরা উভয়টার নিয়ত করে এহরাম বাঁধা। মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা আদায় করা ও এহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। হজের সময় হলে একই এহরামে মিনা-আরাফায় গমন ও হজের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।

খ) মীকাত থেকে শুধু উমরার নিয়তে এহরাম বাঁধা। পবিত্র মক্কায় পৌঁছার পর উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে হজের নিয়ত উমরার সাথে যুক্ত করে নেয়া। উমরার তাওয়াফ-সাঈ শেষ করে, এহরাম অবস্থায় হজের অপেক্ষায় থাকা ও ৮ জিলহজ একই এহরামে মিনায় গমন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করা।

ইফরাদ হজ

হজের মাসগুলোয় উমরা না করে শুধু হজ করাকে ইফরাদ হজ বলে। এ ক্ষেত্রে মীকাত থেকে শুধু হজের নিয়তে এহরাম বাঁধতে হয়। মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম (আগমনি তাওয়াফ) করা। ইচ্ছা হলে এ তাওয়াফের পর সাঈও করা যায়। সে ক্ষেত্রে হজের ফরজ-তাওয়াফের পর আর সাঈ করতে হবে না। তাওয়াফে কুদুমের পর এহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। ৮ জিলহজ একই এহরামে হজের কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মিনার দিকে রওয়ানা হওয়া। ইফরাদ হজকারীকে হাদী জবেহ করতে হয় না। তাই ১০ জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপের পর মাথা মুণ্ডন করে ইফরাদ হজকারী প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যেতে পারে।

---

[১] - لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت (বোখারি : হাদিস নং ১৬৬০) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : لو ظهر لي هذا الرأي الذي رأيته الآن لأمرتكم به في أول الأمر وابتداء خروجي - অর্থ্যাৎ এখন যে অভিমত ব্যক্ত করলাম তা যদি পূর্বে প্রতীয়মান হত, তাহলে আমি শুরুতেই যাত্রা আরম্ভ করার সময় তোমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিতাম।

বদলি-হজ

যদি কোনো ব্যক্তি ফরজ হজ আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির হজ পালনকে বদলি হজ বলে। কয়েকটি হাদিস থেকে বদলি হজের বিধান পাওয়া যায়। নীচে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হল।

১.খাছআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর যে ফরজ আরোপ করেছেন তা আমার পিতাকে খুব বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে। তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তবে কি আমি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ঘটনাটি ছিল বিদায় হজের সময়কার।[১]

২. আবু রাযিন আল আকিলি থেকে বর্ণিত। তিনি এসে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমার পিতা খুব বৃদ্ধ, তিনি হজ ও উমরা পালন করতে পারেন না। সওয়ারির ওপর উঠে চলতেও পারেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ ও উমরা করো।[২]

৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ – শুবরামার পক্ষ থেকে লাব্বাইক। তিনি বললেন, শুবরামা কে? লোকটি বললেন, আমার ভাই বা আত্মীয়। তিনি বললেন, তুমি কি নিজের হজ করেছ? লোকটি বললেন, না। তিনি বললেন, আগে নিজের হজ করো। তারপর শুবরামার হজ।[৩]

তিন প্রকার হজের মধ্যে বদলি হজ কোন প্রকার হবে তা, যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করা হচ্ছে (المحجوج عنه) তিনি নির্ধারণ করে দেবেন। যদি ইফরাদ করতে বলেন তাহলে ইফরাদ করতে হবে, যদি কেরান করতে বলেন তাহলে কেরান করতে হবে, আর যদি তামাত্তু করতে বলেন তাহলে তামাত্তু করতে হবে। এর অন্যথা হলে হবে না। বদলি-হজ, ইফরাদ হজ হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বরং ওপরে উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদিসে হজ ও উমরা উভয়টার কথাই আছে। এতে, বদলি হজকারী তামাত্তু হজ করতে পারবে, এর দিকে ইশারা রয়েছে।

বদলি হজকারী ইফরাদ ভিন্ন অন্য কোনো হজ করলে তার হজ হবে না, হাদিসে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা খোঁজে পাওয়া যায় না। 'হজ' শব্দ উচ্চারণ করলে শুধুই ইফরাদ বোঝাবে, এর পেছনেও কোনো শক্ত প্রমাণ নেই। কেননা হজের সাথে উমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে বলে এক হাদিসে এসেছে। دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ (হজে উমরা প্রবিষ্ট হয়েছে)[৪] তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাছয়াম গোত্রের মহিলাকে তাঁর পিতার বদলি-হজ করার অনুমতি দেয়ার সময় যে বলেছেন, فَحُجِّيْ عَنْهُ তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ করো', এর দ্বারা তিনি উমরাবিহীন হজ বুঝিয়েছেন, এ কথার পেছনে আদৌ কোনো যুক্তি নেই।

বদলি-হজ কেবলই ইফরাদ হজ হতে হবে, ফেকাহশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবেও এ কথা লেখা নেই। ফেকাহশাস্ত্রের কিতাবে যা লেখা আছে, তা হল, বদলি-হজ যার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তিনি যে ধরনের নির্দেশ দেবেন সে ধরনের হজই করতে হবে। এখানে আমি প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়েউস্‌সানায়ের ((بدائع الصنائع কিছু এবারত তুলে দিচ্ছি—

إذا أمر بحجة مفردة أو بعمرة مفردة، فقرن فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يجزي ذلك عن الآمر، نستحسن وندع القياس فيه--- ولو أمره أن يحج عنه، فاعتمر ضمن، لأنه خالف، ولو اعتمر، ثم حج من مكة، يضمن النفقة في قولهم جميعا، لأمره له بالحج بسفر، وقد أتى بالحج من غير سفر، لأنه صرف سفره الأول إلى العمرة، فكان مخالفا، فيضمن النفقة —

ولو أمره بالحج عنه بجمع بين إحرام الحج والعمرة، فأحرم بالحج عنه وأحرم بالعمرة عن نفسه، فحج عنه ،واعتمر عن نفسه، صار مخالفا في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة.

অর্থাৎ, (যিনি বদলি-হজ করাচ্ছেন) তিনি যদি শুধু হজ করার নির্দেশ দেন অথবা শুধু ওমরা করার নির্দেশ দেন, আর বদলি-হজকারী কেরান হজ করল তবে বদলি-হজকারীকে—ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর কথা অনুসারে—ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর নিকট, নির্দেশকারীর পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। এটাকে বরং এস্তেহসান মনে করি ও এ ব্যাপারে কিয়াস ছেড়ে দিই। যিনি বদলি হজ করাচ্ছে, তিনি যদি হজ করার নির্দেশ দেয় আর বদলি-হজকারী উমরা করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা সে নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেনি। আর যদি সে উমরা করে, ও পরবর্তীতে মক্কা থেকে হজ করে তা হলে সকলের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা বদলি-হজকারীর প্রতি,

---

[১] - يارسول الله إن فريضة الله على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال: نعم ، وذلك في حجة الوداع (বোখারি : হাদিস নং ১৪১৭)

[২] قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن فقال حج عن أبيك واعتمر (তিরমিযী : হাদিস নং ৮৫২)

[৩] - عن ابن عباس أن رسول الله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال أخي أو قريب لي. قال :هل حججت؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (আবুদাউদ : হাদিস নং ১৪২৪)

[৪] - মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮

যিনি হজ করালেন, তার নির্দেশ ছিল সফরটা হজের জন্য করার, পক্ষান্তরে সে সফর ব্যতীতই করেছে। কারণ প্রথম সফরটা সে উমরার জন্য ব্যবহার করেছে। তাই নির্দেশের উল্টো কাজ করেছে, সে জন্যই তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি নির্দেশদাতা হজ ও উমরা উভয়টা এক এহরামে একত্রিত করে আদায় করতে বলেন, আর বদলি-হজকারী নির্দেশদাতার জন্য শুধু হজ করল, কিন্তু উমরা করল নিজের জন্য, তবে সে—ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর এক আপাত বর্ণনা অনুসারে—নির্দেশের উল্টো করল।[১]

ওপরের উদ্ধৃতি এটা স্পষ্ট যে বদলি-হজ যিনি করাচ্ছেন তাঁর কথা মতো হজ সম্পাদন করতে হবে। তিনি যে ধরনের নির্দেশ দেবেন সে ধরনের হজ করতে হবে। নির্দেশ মোতাবেক হজ না করলে কোথায় কোথায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বদলি-হজকারীকে, সর্বাবস্থায় ইফরাদ হজ করতে হবে, এ কথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ কেউই বলেননি।

---

[১] - বাদায়েউস্ সানায়ে : খন্ড ২, পৃঃ ২১৩-২১৪

বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রা: কিছু দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশ থেকে দ'ভাবে হজের সফর সম্পন্ন করতে পারেন। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও প্রাইভেট হজ-এজেন্সির মাধ্যমে। সরকারী ব্যবস্থাপনার আওতায় দুটি ক্যাটাগরি রয়েছে সবুজ ও নীল। এ দুটোর যে কোনো একটার আওতাভুক্ত হয়ে হজের সফর সম্পন্ন করতে পারেন। সবুজ ক্যাটাগরির হাজিদের জন্য মক্কা-মদিনায় প্রায় আধা কিলোমিটার এবং নীল ক্যাটাগরির হাজিদের জন্য এক কিলোমিটার বা তার থেকেও বেশি দূরত্বে বাসা বরাদ্দ করা হয়।

বাসা-হোটেল কাছে দূরে, উন্নত-অনুন্নত হওয়ার উপর ভিত্তি করেই সবুজ ও নীল ক্যাটাগরি নির্ণয় করা হয়; কেননা অন্যান্য খরচ উভয় ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে অভিন্ন। আপনি সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ-গমন বিষয়ে মনস্থির করলে ধর্ম-মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেয়া সময় ও নিয়ম অনুযায়ী টাকা জমা দিন। ধর্ম-মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম পূরণ করে যে কোনো অনুমোদিত ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে প্রদত্ব রসিদ নিয়ে জেলা প্রশাসকের অফিসে রিপোর্ট করুন। টাকা জমা দেয়ার রসিদ ও অন্যান্য কাগজ পত্র রাখতে হবে যত্ন সহকারে ও তা দেখিয়ে অফিস থেকে বলে দেওয়া সময়ে উপস্থিত হয়ে বিমানের টিকিট ও পিলগ্রিম পাস সংগ্রহ করতে হবে হজ ক্যাম্প থেকে। আপনার জমা দেয়া টাকা যে সব খাতে ব্যয় করা হয় তা হল নিম্নরূপ:

১. বিমান ভাড়া। ২. এম্বারকেশন ফি। ৩. ভ্রমণ কর। ৪. ইনস্যুরেন্স ও সারচার্জ (ব্যাজ কার্ড, পুস্তিকা, কবজি-বেল্ট, আই,টি সার্ভিস, পিলগ্রিম পাস ইত্যাদি) ৬. মুয়াল্লিম - সৌদি আরবের হজ কন্ট্রাক্টার ফি ৭. মক্কা ও মদিনা শরীফের বাড়ি ভাড়া ৮. সৌদি আরবে অবস্থানকালীন খাওয়া-দাওয়া ও কোরবানি খরচ যা হাজিদেরকে বাংলাদেশেই ফিরিয়ে দেয়া হয়।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার আওতায় “এ+” “এ” “বি” “সি” ইত্যাদি ক্যাটাগরি রয়েছে। আপনার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী ক্যাটাগরি নির্বাচন করুন। যেসব এজেন্সির সুনাম, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সরকারের অনুমোদন রয়েছে সে গুলোর মধ্যে কোনো একটি তালাশ করে বের করুন। তাদের নির্ধারিত টাকা চুক্তি মাফিক পরিশোধ করুন। পাকা রসিদ ব্যতীত কেবল বিশ্বাসের ওপর টাকা দেবেন না কখনো। খরচের হিসাব এবং কী-কী সুবিধা আপনি তাদের কাছ থেকে পাবেন, এ ব্যাপারে মৌখিক নয়, বরং লিখিত চুক্তি করুন। যদিও আপনি এজেন্সি কর্তৃক ঘোষিত সুবিধাসমূহের অনেকগুলো থেকে খুব করুণভাবে বঞ্চিত হবেন তবুও। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এমন কাফেলা বা এজেন্সিকে কখনো টাকা দেবেন না।

হজ যাত্রীদের করণীয়

১. স্বাস্থ্য পরীক্ষা: প্রতি জেলায় সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। এ বোর্ডের মাধ্যমেই ব্যবস্থা করা হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মেনিনজাইটিস প্রতিরোধক টিকা, যা বাধ্যতামূলক, এ বোর্ডের মাধ্যমেই প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকা নিয়ে এ বোর্ড থেকে আপনাকে মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। জেলা পর্যায়ে এ কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে ঢাকায় হজ ক্যাম্পে এসে সম্পূর্ণ করবেন। এ সনদ ব্যতীত হজে যাওয়া সম্ভব হবে না।

২. পুলিশ ছাড়পত্র: সরকারী ব্যবস্থাপনার হাজিদের জন্য জেলা প্রশাসকগণ পুলিশ সুপারের নিকট ছাড়পত্রের জন্য হজযাত্রীদের তালিকা প্রেরণ করেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সেরে হজ অফিসে ছাড়পত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

৩. হজ প্রশিক্ষণ: সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনেচ্ছুদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে সুবিধা মত সময়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে হজ যাত্রার ৩ দিন পূর্বে হজ ক্যাম্পে অবস্থানের সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর কোনো-কোনোটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৌদি আরব গমনের পূর্বেই একদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এসব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করা উচিত। এ ছাড়াও কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেম অথবা মসজিদ কর্তৃপক্ষ হজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে সেখানেও অংশ গ্রহণ করা উচিত। হুজ্জাজ চেরিট্যাবল সোসাইটি বিভিন্ন জায়গায় এ ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

অন্যান্য করণীয় ঃ ঢাকা হজ ক্যাম্পে

হজ অফিস থেকে প্রেরিত অনুমতিপত্রে নির্ধারিত যে তারিখ থাকবে, সে তারিখে সকাল ১০টার মধ্যে হজ ক্যাম্পে গিয়ে রিপোর্ট করবেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীগন এজেন্সির পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। হজ ক্যাম্পে রিপোর্ট করার সময় সরকারী ব্যবস্থাপনার হাজিগণ সাথে করে আনবেন অনুমতিপত্র, ব্যাংকে টাকা জমা-দেয়ার ডুপ্লিকেট রসিদসমূহ, মেডিকেল সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট এজেন্সির পরামর্শ অনুযায়ী সঙ্গে আনতে হবে।

হজ ক্যাম্প ডরমিটরিতে শুধুমাত্র হজযাত্রীদের অনুমতি দেয়া হয়। তাই আত্মীয় স্বজন সাথে আনা উচিত নয়। তবে নীচ তলায় আত্মীয় স্বজনগণ তাদের হজযাত্রীকে নানাবিধ দাপ্তরিক কাজে সহায়তা দিতে পারেন। হজ ক্যাম্পে পান খাওয়া বা ধূমপান করা নিষিদ্ধ। প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহের জন্য রয়েছে ৩ টি ক্যান্টিন যা খোলা থাকে রাত দিন ২৪ ঘণ্টা। তাই বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। টিকিট, পিলগ্রিম পাস, বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য কাগজপত্র খুবই যত্নের সহিত সংরক্ষণ করবেন। এ গুলো হারিয়ে গেলে হজে যাওয়া সম্ভব হবে না। মালামাল বহনের জন্য যে লাগেজ বহন করবেন তার গায়ে নাম, পিলগ্রিম পাস নং ও ঠিকানা লিখে নেবেন। কমপক্ষে ২সেট এহরাম, ২সেট পায়জামা-পাঞ্জাবি, ২টি লুঙ্গি, ২টি টুপি, ২টি গেঞ্জি, একটি তোয়ালে, ২টি গামছা সঙ্গে নেবেন। শীত মৌসুম হলে দু একটি গরম কাপড় বিশেষ করে চাদর সঙ্গে নেবেন। আপনার কোন অসুখ থেকে থাকলে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সঙ্গে নেবেন। বাংলাদেশ হজ মিশন জটিল কোনো রোগের চিকিৎসা দেয় না। সৌদি আরবে ওষুধের দামও প্রচুর। তাই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হবেন।

জেদ্দা বিমান বন্দরে

জেদ্দা বিমান বন্দরে বিমান থেকে বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে অপেক্ষা করুন। বিশ্রাম কক্ষ হতে বহির্গমন বিভাগে গিয়ে পিলগ্রিম পাসে সিলমোহর লাগাতে হবে। এখানে আপনাকে লাইন বেঁধে বসতে হবে। পিলগ্রিম পাসে সিল লাগানো সম্পূর্ণ হলে আপনার ব্যাগ সংগ্রহ করবেন। ব্যাগ মেশিনে স্ক্যান করিয়ে মূল বিল্ডিং থেকে বের হয়ে যাবেন। বের হওয়ার গেটেই ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ আপনার কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে নেবে যা আপনি জায়গা মতো পেয়ে যাবেন।

একটু সামনে এগোলে কিছু অফিসার দেখতে পাবেন। তারা আপনার পিলগ্রিম পাসে বাসের টিকিট লাগিয়ে দেবে। কোনো একটি টিকিট অব্যবহৃত থেকে গেলে তার পয়সা দেশে আসার সময় ফেরত পাবেন যা জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে।

বাংলাদেশের পতাকা টানানো জায়গায় গিয়ে পাসপোর্টে মুয়াল্লিমের স্টিকার লাগাবেন। এরপর বাসে ওঠার জন্য লাইন ধরে দাঁড়াবেন। আপনার মাল-সামানা গাড়িতে ওঠানো হল কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন। বাসে ওঠার পর ড্রাইভার হজ যাত্রীদের পিলগ্রিম পাস (পাসপোর্ট) নিয়ে নেবেন, এবং মক্কায় পৌঁছে হজ কন্ট্রাক্টর (মুআস্‌সাতুত তাওয়াফার) কাছে সেগুলো হস্তান্তর করবেন।

মক্কায় ও মদিনায়

বাস থেকে নেমে প্রথমে নিজের মাল-সামানা সংগ্রহ করে নেবেন। মাল-সামানা নিয়ে সরকার অথবা এজেন্সির ভাড়া-করা বাসায় আপনার জন্য নির্দিষ্ট করে-দেয়া কক্ষে গিয়ে উঠবেন। প্রথমে মক্কায় এসে থাকলে গোসল করে খাওয়া দাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে উমরা আদায়ের প্রস্তুতি নিন। সরকারি ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হলে আপনার ফ্ল্যাটে অথবা আপনার নাগালের মধ্যে কোনো আলেম আছেন কি-না তা জেনে নিন। আলেম না পেলে হজ উমরা বিষয়ে যাকে বেশি জ্ঞানসম্পন্ন মনে হবে তার নেতৃত্বে উমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। যাওয়ার পথে কিছু জিনিসকে আলামত হিসাবে নির্ধারণ করবেন যাতে হারিয়ে গেলে সহজেই আপনার বাসা খুজে বের করতে পারেন। আলেম অথবা নেতা নির্ধারণের সময় হকপন্থী কি-না, তা ভালো করে যাচাই করে নেবেন। অন্যথায় আপনার উমরা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

মক্কায় পৌঁছার পর মুয়াল্লিম অফিস থেকে দেয়া বেল্ট সবসময় সঙ্গে রাখবেন। এ বেল্টে মুয়াল্লিম অফিসের নম্বর লেখা আছে, যা আপনি হারিয়ে গেলে কাজে লাগবে। ঘর হতে বাইরে যাওয়ার সময় বেশি টাকা পয়সা সঙ্গে রাখবেন না। কেননা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে অথবা পকেটমারের পালায় পড়তে পারেন। আর সবসময় দলবদ্ধ হয়ে চলার চেষ্টা করবেন। একা কখনো ঘরের বাইরে যাবেন না যতক্ষণ না আপনার বাসার লোকেশন ভালভাবে আয়ত্ব করতে না পারেন।

রোদের মধ্যে বাইরে বেশি ঘোরা-ফেরা করবেন না। প্রচুর ফলের রস ও পানি পান করবেন। প্রয়োজনে লবণ মিশিয়ে পান করবেন। অনেকেই একের পর এক উমরা করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে বাংলাদেশ হজ মিশনের ডাক্তার অথবা সৌদি সরকার কর্তৃক স্থাপিত চিকিৎসাকেন্দ্রসমূহে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ সংগ্রহ করবেন। এ ব্যাপারে কোন অলসতা করা উচিত হবে না। কেননা হজের কার্যক্রম অসুস্থ শরীর নিয়ে সম্পন্ন করা খুবই কঠিন। হজ এজেন্সি বা মুয়াল্লিমের সাথে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠান্ডা মাথায় সমাধানের চেষ্টা করবেন। বাংলাদেশ হজ মিশনের কর্মকর্তাদের সাহায্যও নিতে পারেন, যদি প্রয়োজন মনে করেন।

মিনায়-আরাফায়

৭ জিলহজ দিবাগত রাতে অথবা ৮ জিলহজ সকালে এহরাম অবস্থায় মুয়াল্লিম কর্তৃক সরবরাহ-কৃত বাসে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। সাথে হালকা কিছু কাপড়-চোপড়, শুকনো খাবার ও সামান্য টাকা পয়সা নেবেন। মূল্যবান জিনিসপত্র

সাবধানে ঘরে রেখে যাবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে টাকা পয়সা মুয়াল্লিমের অফিসের কর্মকর্তার নিকট জমা রাখতে পারেন। তবে টাকা আমানত রেখে রসিদ নিতে ভুলবেন না। শক্ত-সবল এবং মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করায় অভ্যস্ত না হলে মিনা আরাফায় পায়ে হেঁটে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন না।

কঙ্কর মারার সময় কখনো পায়ের স্যান্ডেল খুলে গেলে অথবা হাত হতে কঙ্কর পড়ে গেলে তা উঠাতে চেষ্টা করবেন না। নিজেরা হাদী জবেহ করার পরিকল্পনা করলে সবার পক্ষ থেকে সবল ও তরুণ ২/৩ জনকে প্রতিনিধি করে হাদী জবেহ করবেন। তবে এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় মক্কা মদিনায় যে কোনো ব্যাংকে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হজযাত্রীদের পক্ষ থেকে হাদী জবেহ করে দেবেন। এই প্রক্রিয়াটি সহজ ও নিশ্চিত। তাই অতি লোভনীয় অন্যসব প্রস্তাব বাদ দিয়ে এটাই বেছে নিন। মিনায় বা আরাফায় কখনও নিজের তাঁবু হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশ হজ মিশনের তাঁবুতে পৌঁছার চেষ্টা করুন। সেখান থেকে কোনো না কোনো উপায়ে নিজ তাঁবুতে ফিরে আসার ব্যবস্থা হবে, অথবা আপনার হজ পালনে কোনো সমস্যা হবে না।

আরাফার ময়দানে জাবালে আরাফায় উঠার চেষ্টা করবেন না এমনকি তার কাছেও যাওয়ার চেষ্টা থেকেও বিরত থাকুন। আরাফায় হারিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে নিজ তাঁবুতে ফিরে আসা খুবই কঠিন। তাই নিজ তাঁবুতেই অবস্থান করুন। টয়লেট ব্যবহার করতে হলেও কাউকে সঙ্গে নিয়ে বের হোন। মুযদালেফাতেও টয়লেট ব্যবহারের প্রয়োজন হলে একই পন্থা অবলম্বন করুন।

হজের সফর শুরু

১.সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাবেন না বেসরকারি কাফেলা- ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে যাবেন এসব ব্যাপারে সৎ-নেককার ও অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিন, ও এস্তেখারা করুন। এস্তেখারার নিয়ম হল—প্রথমে ভাল করে ওজু করুন। দু'রাকাত সালাত আদায় করুন ও মনযোগের সাথে এই দোয়াটি পড়ুন ও الأمر। শব্দের পর যে বিষয়ে এস্তেখারা করছেন সে বিষয়টি উল্লেখ করুন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي[১]

২. সফরে বের হওয়ার পূর্বে মুস্তাহাব হল, দেনা-পাওনা বিষয়ে একটি অসিয়তনামা লেখা[২] ও উক্ত অসিয়তনামায় একজনকে সাক্ষী হিসেবে রাখা।

৩. আপনার কাছে কেউ কোনো জিনিস আমানত রেখে থাকলে তা মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দিন।

৪. ছেলে-সন্তান, পরিবার পরিজনকে তাকওয়া-পরহেজগারির ব্যাপারে বুঝান, অসিয়ত করুন। তারা যেন আপনার অনুপস্থিতিতে আরো বেশি একাগ্রতা নিয়ে দ্বীন-ধর্ম মেনে চলে, কোনো পাপ কর্মের ধারে-কাছে না যায় এ সব ব্যাপারে তাদেরকে বুঝান। এ ধরনের অসিয়ত ইসলামি শরিয়তে মুস্তাহাব।

৫. কোনো হক্কানি আলেম বা নেককার ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সফর-সঙ্গী হোন। তাতে হজ-ওমরা পালনসহ তাকওয়া-পরহেজগারির সীমানায় থেকে হজের পবিত্র সফর সম্পন্ন করা সহজ হবে। বিশেষ করে ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে-থাকা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৬. পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, আলেম-ওলামা ও আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে বলে-কয়ে বিদায় নেয়া মুস্তাহাব।[৩]

৭. যাদেরকে ছেড়ে হজের সফরে বের হচ্ছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন,'أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ' -আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে- থাকা কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না'[১] নবী আকরাম (ﷺ) তাঁর

---

[১] - বোখারি : হাদিস নং ১০৯৬

[২] - আব্দুল্লাহ বিন ওমরের (রা.) একটি হাদিসে পরিষ্কারভাবে এ কথাটি ব্যক্ত হয়েছে।

[৩] - দেখুন ইবনে মাযাহ : হাদিস নং ২৮২৫

সাথিদের কেউ সফরে বের হওয়ার উপক্রম করলে তিনি বলতেন, أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ– আমি তোমার দ্বীন তোমার আমানত এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর হেফাযতে ছেড়ে যাচ্ছি।'[২] কোনো মুসাফির রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট নসিহতের প্রার্থনা করলে আল্লাহর রাসূল বলতেন—

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন। তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং তুমি যেখানেই অবস্থান করো তোমার জন্যে কল্যাণকে সহজলভ্য করে দিন।[৩]

৮. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব—

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিজে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে, এবং অপর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে, নিজে পদস্খলিত হওয়া থেকে, এবং অপর দ্বারা পদস্খলিত হওয়া থেকে। কারো উপর জুলুম করা থেকে এবং আমি কারো দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে। কারো সাথে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা থেকে, এবং অন্যের মূর্খতা জনিত আচরণে আক্রান্ত হওয়া থেকে।[৪]

৯. গাড়ি, বিমান বা যে কোন যানবাহনে উঠে দোয়া পড়া মুস্তাহাব। সে হিসেবে যানবাহনে উঠে এই দোয়াটি পড়ুন—

اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحانَ الذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنْ، وإِنَّا إِلَى ربِّنَا لَمُنْقَلِبُون، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنا هَذَا البِرَّ والتَّقْوى، ومِنَ الْعَمَلِ ما تَرْضَى، اللَّهُمَّ هوِّن عَلَيْنا سَفَرَنا هَذَا واطْوِعنَّا بُعدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ والأَهْلِ.

(আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্যে একে বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের নিকট। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পূর্ণ হেদায়েত ও তাকওয়ার এবং এমন আমলের যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এ সফরকে সহজসাধ্য করে দাও। হে আল্লাহ! এ সফরে তুমিই আমাদের সাথি আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমিই খলিফা (রক্ষণাবেক্ষণ কারী) হে আল্লাহ অমারা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের ক্লেশ হতে ও অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে।[৫]

১০. সফরে সকলে মিলে একজনকে আমির নির্ধারণ করা মুস্তাহাব। এতে করে যে কোন বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, এবং ঐক্য সুদৃঢ় হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন, তিনজনের একটি দল সফরে বের হলে একজনকে যেন আমির বানিয়ে নেয়া হয়।[৬]

১১.পথে কোথাও অবস্থানের প্রয়োজন হলে দলের সকলে একত্রে একস্থানে মিশে থাকা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কতিপয় সাহাবি কোথাও অবতরণ করলে বিভিন্ন উপত্যকা এবং গিরিপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (এ কাজের নিন্দা জানিয়ে) বলেন, তোমাদের এ বিক্ষিপ্ততা শয়তানের পক্ষ থেকে।

১২. সফর অবস্থায় কোথাও অবতরণ করলে এই দোয়াটি পড়বেন

أَعَوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ

"আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সৃষ্ট-বস্তুর সমুদয় অনিষ্ট থেকে।'[৭] যদি কোন ব্যক্তি নতুন স্থানে গিয়ে এ দোয়া পড়ে তাহলে সেখান থেকে ফেরত আসা পর্যন্ত কোন বস্তু তার বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না।

১৩. উঁচু স্থানে ওঠার সময় الله أكبر বলা এবং নিচুস্থানে অবতরণের সময় سبحان الله -বলা মুস্তাহাব। জাবের (ﷺ) বর্ণিত হাদিস তাই প্রমাণ করে।[৮] তবে হজের এহরাম অবস্থায় তালবিয়া পাঠের সময়সীমায় উল্লেখিত জায়গাসমূহে তালবিয়া পড়া বাঞ্ছনীয়।

১৪. সফরে ভোরের আলো ফুটতে লাগলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া মুস্তাহাব -

---

[১] - আহমদ : ২/৪০৩

[২] - আলবানী : সহিহু আবি দাউদ :২/৪৯৩

[৩] - তিরমিযী : হাদিস নং ৩৩৬৬

[৪] - আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৪৩০

[৫] - মুসলিম : হাদিস নং ১৩৪২

[৬] – إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (আবু দাউদ:২২৪১)

[৭] - মুসলিম : ২/২০৮০

[৮]- বোখারি : হাদিস নং ২৯৯৩

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

শ্রোতা শুনুক আমাদের কর্তৃক আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর উত্তম নেয়ামতের বর্ণনা। হে অমাদের প্রতিপালক, আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের উপর অনুকম্পা ও নিয়ামত বর্ষণ করুন। আশ্রয় চাইছি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে।[১]

১৫. সফরে বেশি পরিমাণ আল্লাহর নিকট দোয়া করা মুস্তাহাব; কারণ সফরে দোয়া কবুল হয়ে থাকে এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করা হয়।

১৬. জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে মানুষদেরকে বারণ করবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে জরুরি হচ্ছে, যে বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ করবেন, আগে নিজে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবেন এবং নম্র ব্যবহার ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে তা প্রয়োগ করবেন।

১৭. সর্বপ্রকার অন্যায়-অপরাধ ও গুনাহ থেকে দূরে থাকবেন। কাউকে মন্দ বলবেন না। কাউকে শারীরিকভাবে কষ্ট দেবেন না। এমন ভিড় ও জটলা পাকাবেন না যে অপর হাজিদের কষ্ট হয়। সবসময় ভিড় এড়িয়ে চলবেন। সকল প্রকার গিবত দোষচর্চা, পরনিন্দা কুৎসা রটনা মুনাফেকিসহ পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়, দূরত্ব সৃষ্টি হয়, শ্রদ্ধাবোধ লোপ পায় এমন সকল কাজ এড়িয়ে চলবেন। মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবেন। এবং না জেনে ধর্মীয় কোন বিষয়ে মুখ খুলবেন না। মোটকথা যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ বর্জন করবেন কঠিনভাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

–হজ হয় সুবিদিত কয়েকটি মাসে। যে কেউ এ মাস গুলোতে হজ করা স্থির করে, তার জন্য হজে যৌনতা, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।[২] তাছাড়া হারাম এলাকার ন্যায় পবিত্র স্থানে কোনো গুনাহ করা অন্য স্থানের মতো নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

–আর যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে সীমা-লঙ্ঘন করার ইচ্ছা পোষণ করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।[৩]

১৮. অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় সকল ফরজ ও ওয়াজিবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন যার শীর্ষে রয়েছে সালাত। বিশেষ করে ফরজ সালাতসমূহ জামাতের সাথে সময় মত আদায়ে সবিশেষ যত্নবান থাকবেন, পাশা-পাশী অন্যান্য ইবাদত, যথা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আযকার, দোয়া, পরোপকার, দান-সদকা ইত্যাদি অধিক পরিমাণে করার চেষ্টা করবেন।

১৯. সফর অবস্থায় মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে সুন্দর আচরণ বজায় রাখবেন।

২০. যারা দুর্বল, সফর অবস্থায় তাদের সহায়তা করুন, পয়সা দিয়ে হোক শ্রম দিয়ে হোক বা পরামর্শের মাধ্যমে হোক যে কোনো উপায়ে তাদেরকে সহায়তা করার চেষ্টা করুন। নিজ সাথিবৃন্দের প্রতিও এরূপ সহমর্মীতাপূর্ণ আচরণ করে যাবেন।

২১. সফরের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলে খুব দ্রুত বাড়ি ফিরে আসবেন। অকারণে বিলম্ব করবেন না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সফর আযাবের একটি টুকরো বিশেষ। তোমাদেরকে স্বাধীন ভাবে খাবার, পানীয় ও নিদ্রা হতে বাঁধা দিয়ে থাকে, সুতরাং তোমাদের সফরের কাজ সারা হয়ে গেলেই অতি দ্রুত পরিজনের নিকট ফিরে আসবে।

২২. সফর থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত দোয়া ও জিকিরগুলো পড়া মুস্তাহাব। নবী (ﷺ) যখন কোন যুদ্ধ বা হজ-উমরার সফর থেকে ফিরতেন তখন প্রত্যেক উঁচু স্থানে তিন বার করে الله أكبر বলতেন। অত:পর বলতেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। অমরা প্রত্যাবর্তন করছি সফর থেকে তাওবা করতে করতে, ইবাদতরত অবস্থায়, এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করে করে। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সকল গোত্রকে একাই পরাভূত করেছেন।'[৪]

২৩. দীর্ঘ দিনের সফর হলে একান্ত প্রয়োজন না হলে রাত্রিকালে বাড়ি ফিরতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন।

২৪. সফর থেকে ফেরার পর বাড়ি প্রবেশের পূর্বে পাশের মসজিদে গিয়ে দু' রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করতেন।[৫]

---

[১]- মুসলিম : হাদিস নং ৪৮৯৫

[২] - সূরা আল বাকারা : ১৯৭

[৩] - সূরা আল হাজ্জ : ২৫

[৪] - বুখারী ৭/১৬৩ মুসলিম ২/৯৮০

[৫] - أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين (মুসলিম : ২৪২৮)

২৫. সফর থেকে ফেরার পর নিজ পরিবার ও আশে পাশের শিশুরা তাকে ইস্তেকবাল-অভ্যর্থনা করলে তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করা, তাদের স্নেহ করা, মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (ﷺ) এর হাদিসের দাবিও তাই।

২৬. অপরকে হাদিয়া দেয়া এবং অপরের হাদিয়া গ্রহণ করা মুস্তাহাব। এর মাধ্যমে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, মনের কৌলীন্য দূর হয়। এবং সহাবস্থান সহজ হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন, তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান- প্রদান কর এতে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

২৭. মুসাফির সফর থেকে ফিরে এলে তার সাথে মু'আনাকা করা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ করতেন বলে হাদিসে এসেছে, যেমন আনাস (ﷺ) বলেন, তাঁরা (সাহাবাগণ) যখন পরস্পর মিলিত হতেন মুসাফা করতেন আর যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন মুআনাকা করতেন।[১]

২৮. সফর থেকে ফিরে এসে স্বীয় সাথি সঙ্গী ও বন্ধু বান্ধবদের একত্রিত করা এবং খাবারের আয়োজন করা মুস্তাহাব।

মীকাত ও এহরাম

মীকাত

স্থান অথবা কালের সীমারেখাকে মীকাত বলে। অর্থাৎ এহরাম ব্যতীত যে স্থান অতিক্রম করা যায় না, অথবা যে সময়ের পূর্বে হজের এহরাম বাঁধা যায় না সেটাই হল মীকাত।

স্থান বিষয়ক মীকাত (মীকাতে মাকানি)

বেশ দূর থেকে এহরাম বেঁধে রওয়ানা হওয়া আল্লাহর পানে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছা-আগ্রহকে আরো মজবুত, আরো পরিপক্ব করে তোলে। নিজের ঈমানি জোশ-জযবাকে শতগুণ বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে বহুগুণে দৃঢ় করে দেয় এ ধরনের প্রস্তুতি। এ জন্যই, হয়তো, হজে মীকাতের নিয়ম রাখা হয়েছে। মীকাত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সীমানা বেঁধে দিয়েছেন—মদিনাবাসীদের জন্য যুল হুলায়ফা, শামবাসীদের জন্য জুহফাহ, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়েমেনবাসীদের জন্য য়ালামলাম, এগুলো তাদের জন্য এবং যারা অন্যত্র থেকে ওই পথে আসে হজ ও উমরা আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে তাদের জন্য। আর যারা এ সীমার অভ্যন্তরে বসবাস করবে তাদের স্বস্থানই তাদের এহরামের জায়গা। তদ্রূপভাবে মক্কাবাসী মক্কা থেকে।[৩] অন্য এক হাদিসে ইরাকবাসীদের মীকাত যাতু ইর্‌ক নির্ধারণ করা হয়েছে।[৪]

মক্কা থেকে মীকাতসমূহের দূরত্ব

যুল হুলায়ফা: মক্কা থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমানে আবয়ারে আলী বলে জায়গাটি পরিচিত। মদিনাবাসী এবং ওই পথ হয়ে যারা আসেন যুল হুলায়ফা তাদের মীকাত।

জুহফাহ: এই জায়গাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হওয়ায় **রাবেগ** থেকে মানুষেরা এহরাম বাঁধে। মক্কা থেকে রাবেগের দূরত্ব ১৮৬ কিলোমিটার। সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার লোকজন, পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার লোকজন, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও ফিলিস্তিনবাসীরা এই জায়গা হতে এহরাম বাঁধেন।

কারনুল মানাযেল: এই জায়গার অন্য নাম **আস্‌সাইলুল কাবির**। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার। ইরাক ইরান ও অন্যান্য উপসাগরীয় অঞ্চলের লোকদের মীকাত হল এই কারনুল মানাযেল।

য়ালামলাম: মক্কা থেকে এর দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। ইয়েমেনবাসী ও পাক-ভারত-বাংলাসহ প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য হতে আগমনকারীদের জন্য মীকাত হল এই য়ালামলাম।

যাতু ইরক: মক্কা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমানে এই মীকাতটি পরিত্যক্ত। কেননা ওই পথ হয়ে বর্তমানে কোনো রাস্তা নেই। স্থল পথে আসা পূর্বাঞ্চলীয় হাজিরা বর্তমানে **সাইল** অথবা যুল-হুলায়ফা থেকে এহরাম বাঁধেন।

---

[১] - كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا (তিবরানী : ১/৯৭) আলবানী এ হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

[২] - দেখুন বোখারি : হাদিস নং ৩০৮৯

[৩] - وقت رسول الله صلى الله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونه فمهله من أهله وكذاك ، حتى أهل مكة من مكة (বোখারি : হাদিস নং ১৪২৯)

[৪] - أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق (মুসলিম : ২/৮৪১)

হাদিস অনুযায়ী মীকাতের বাইরে থেকে আসা হাজিদের জন্য মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা ওয়াজিব। তবে যারা মীকাতের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাস করেন তাদের অবস্থানের জায়গাটাই হল তাদের মীকাত। অর্থাৎ যে যেখানে আছে সেখান থেকেই হজের এহরাম বাঁধবে। তবে মক্কার হারাম এরিয়ার ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি উমরা করতে চায় তা হলে তাকে হারাম এরিয়ার বাইরে– যেমন তানয়ীম তথা আয়শা মসজিদে গিয়ে এহরাম বাঁধতে হবে।

মীকাতে মাকানি বিষয়ে কিছু সমস্যার সমাধান

যদি কারও পথে দুটি মীকাত পড়ে তাহলে প্রথম মীকাত থেকেই এহরাম বাঁধা উত্তম। তবে দ্বিতীয় মীকাত থেকেও এহরাম বাঁধা চলে। বাংলাদেশ থেকে মদিনা হয়ে মক্কায় গমনকারী হাজিগণ এই মাসআলার আওতায় পড়েন। অতঃপর তারা জেদ্দা বিমান বন্দরের পূর্বে যে মীকাত আসে সেখান থেকে এহরাম না বেঁধে মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে যে মীকাত পড়ে—যুল হুলায়ফা—সেখান থেকে এহরাম বাঁধেন।

যদি কোনো ব্যক্তি এহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করতঃ ভেতরে চলে আসে তার উচিত হবে মীকাতে ফিরে গিয়ে এহরাম বাঁধা। এমতাবস্থায় তার ওপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে 'দম' দেয়া ওয়াজিব হবে না। মীকাতে ফিরে না গিয়ে যেখানে আছে সেখান থেকে এহরাম বাঁধলে হজ-উমরা হয়ে যাবে বটে তবে 'দম' দেয়া ওয়াজিব হবে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে, এহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে ফেললে ভেতরে ঢুকে মসজিদে আয়শায় গিয়ে হজের এহরাম বাঁধলে চলবে না, কেননা মসজিদে আয়শা হেরেম এলাকার অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের উমরার মীকাত।

কাল বিষয়ক মীকাত (মীকাতে যামানি)

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'হজ হয় নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসে'।[১]

এ নির্দিষ্ট মাসগুলো হল—শাওয়াল, যিলকদ ও জিলহজ মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত। কারও কারও মতে জিলহজ মাসের পুরোটাই হজের মাস।

শাওয়াল মাস থেকে যেহেতু হজের মাস শুরু হয় তাই শাওয়াল মাসের পূর্বে হজের এহরাম বাঁধা উচিত হবে না। তা বরং খেলাফে সুন্নত ও মাকরূহে তাহরীমি হবে।

এহরাম

এহরামের মাধ্যমে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হারাম করা। হাজি সাহেবগণ হজ অথবা উমরা অথবা উভয়টা পালনের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করেন তখন তাদের উপর কতিপয় হালাল ও জায়েয বস্তুও হারাম হয়ে যায়। একারণেই এ-প্রক্রিয়াটিকে এহরাম বলা হয়।

এহরাম বাধার সময়

হজ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করলে এহরাম ব্যতীত নির্দিষ্ট সীমারেখা—মীকাত—পার হওয়া যায় না, এ বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার সময় বিমানে থাকা অবস্থাতেই মীকাত এসে যায়। মীকাত নিকটবর্তী হলে বিমানে কর্তব্যরত ব্যক্তিরা হাজি সাহেবদেরকে এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেন। সে সময়ই এহরামের নিয়ত করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মীকাতের পূর্বে এহরামের নিয়ত করেননি।[২] তবে বিমানে আরোহণের পূর্বেই এহরামের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নেবেন। শুধুমাত্র নিয়তটা বাকি রাখবেন। বিমানে আরোহণের পূর্বেও এহরামের নিয়ত করতে পারেন, তবে তা খেলাফে সুন্নত হওয়ায় কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন।[৩] আপনি যদি প্রথমে মদিনায় যাওয়ার নিয়ত করে থাকেন তাহলে এসময় এহরামের নিয়ত করার দরকার নেই। কেননা মদিনা থেকে মক্কায় আসার পথে আরেকটি মীকাত পড়বে, সেখান থেকে এহরাম বাঁধলেই চলবে।

এহরাম বাধার নিয়ম

বাংলাদেশ থেকে যারা হজ করতে যান তাদের অধিকাংশই তামাত্তু হজ করে থাকেন। তামাত্তু হজের জন্য দু'বার এহরাম বাঁধতে হয়। প্রথমবার শুধু উমরার নিয়ত করে মীকাত থেকে। দ্বিতীয়বার ৮ জিলহজ তারিখে মক্কা শরীফে যে জায়গায় আপনি আছেন সে জায়গা থেকে। উভয় এহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম-কানুন নীচে উল্লেখ করা হল।

প্রথম এহরামঃ উমরার নিয়তে মীকাত থেকে

---

[১] - الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (সূরা বাকারা : ১৯৭)

[২] - দেখুন, মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮

[৩] - দেখুন : সাইয়েদ সাবেক : ফিকহুস্‌সুন্নাহ , খন্ড ১, পৃঃ৬৫৩

শুরুতে আপনি ক্ষৌরকর্ম অর্থাৎ বগল ও নাভির নীচের চুল পরিষ্কার করুন। নখ কাটুন। মাথার চুল ছোট না করে যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিন, কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম এহরামের পূর্বে মাথার চুল কেটেছেন বা মাথা মুণ্ডন করেছেন বলে কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না। ধুলো-বালি লেগে অতিমাত্রায় উসকোখুসকো হওয়ার আশঙ্কা থাকলে— বর্তমান যুগের যন্ত্র-চালিত সফরে এ ধরনের আশঙ্কা নেই বললেই চলে—বিশেষ পদার্থ ব্যবহার করে চুলকে স্থিরকৃত আকারে রাখার জন্য হাদিসে 'তালবিদ' করার কথা আছে।[১] তবে এহরামের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলা বা চুল ছোট করে ফেলার কথা নেই।

ক্ষৌরকর্ম সেরে সাবান মাখিয়ে গোসল করুন। গোসল করা সম্ভব না হলে ওজু করুন। ওজু-গোসল কোনটাই যদি করার সুযোগ না থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে হবে না। এরপর শরীরে, মাথায় ও দাঁড়িতে উত্তম সুগন্ধি মাখুন।[২] স্বাভাবিক সেলাই করা কাপড় পরে এহরামের কাপড় আলাদা একটি ব্যাগে ঢুকিয়ে হজ ক্যাম্প অথবা বিমান বন্দরে চলে যান। আপনার ফ্লাইটের সময়সূচি জেনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সেরে গাড়িতে ওঠার আগে এহরামের কাপড় পরে নিন। ফরজ নামাজের সময় হলে এহরাম পরার পর নামাজ আদায় করুন। আর ফরজ সালাতের সময় না হলে তাহিয়াতুল ওজুর দু'রাকাত সালাত আদায় করুন। সালাতের পর এহরামের নিয়ত না করে বিমানে আরোহণ করুন। যেহেতু নিয়ত করেননি তাই তালবিয়া পাঠ করা থেকেও বিরত থাকুন। জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছার পূর্বে যখন মীকাতের ব্যাপারে ঘোষণা হবে তখন মনে মনে উমরার নিয়ত করুন ও মুখে বলুন لَبَّيْكَ عُمْرَةً (লাব্বাইকা উমরাতান্), এরপর পুরা তালবিয়া–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكْ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكْ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكْ، لا شَرِيْكَ لَكْ

—পড়ে নিন। মাথায় টুপি থাকলে নিয়ত করার পূর্বেই তা সরিয়ে নিন।

সালাতের পর এহরাম বাধা মুস্তাহাব। যদি ফরজ সালাতের পর এহরাম বাধা হয়, তাহলে স্বতন্ত্র নামাজের প্রয়োজন নেই। অন্য সময় এহরাম বাধলে দু রাকাত সালাত আদায় করে নিবে। এ আদায়কৃত নামাজ কি এহরামের নামাজ না তাহিয়্যাতুল ওজুর—এ ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে এহরামের নামাজ বলেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত হল, এটি তাহিয়্যাতুল ওজু হিসেবে আদায় করা হবে। বিমানের ভেতরে এহরামের নিয়ত করা যদি ঝামেলা মনে করেন তাহলে বিমানে ওঠার পূর্বেই ফরজ সালাত অথবা দু'রাকাত তাহিয়াতুল ওজুর সালাত আদায় করে সালাম ফেরানোর পর মাথায় টুপি থাকলে তা খুলে উপরে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে উমরার নিয়ত করুন ও তালবিয়া পাঠ করুন। এহরামের আলাদা কোনো সালাত নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরজ সালাতের পর এহরামের নিয়ত করেছিলেন।

এহরামে প্রবেশের পর বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন ও জিকির আযকারে ব্যস্ত থাকুন। এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সকল জিনিস থেকে বিরত থাকুন যার বিস্তারিত বর্ণনা একটু পরে আসছে।

দ্বিতীয় এহরাম: হজের নিয়তে মক্কা থেকে

মক্কা শরীফ যাওয়ার পর উমরা আদায়ের পর মাথার চুল খাটো করে অথবা মাথা মুণ্ডন করে এহরাম খুলে ফেলে স্বাভাবিক পোশাক-আশাক পরে ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকুন ও যত বেশি সম্ভব বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করুন। ৮ জিলহজ আবার আপনাকে এহরাম বাঁধতে হবে। এবারের এহরাম হবে হজের নিয়তে। এ এহরামের জন্য কোথাও যেতে হবে না। আপনি যে বাসায় বা হোটেলে আছেন সেখান থেকেই এহরাম বাঁধুন।[৩] পূর্বের ন্যায় ক্ষৌরকর্ম সেরে নিয়ে গোসল করে নিন। শরীরে, দাড়িতে ও মাথায় আতর মাখুন। এহরামের কাপড় পড়ে নিন। ফরজ সালাতের সময় হলে ফরজ সালাত আদায় করুন। অন্যথায় তাহিয়াতুল ওজুর দু'রাকাত সালাত আদায় করুন। এরপর মনে মনে হজের নিয়ত করুন, ও মুখে বলুন لَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বাইকা হাজ্জান) এরপর পুরা তালবিয়া পড়ে নিন।

এহরাম অবস্থায় করণীয়

● এহরাম বাধার পর গভীর মনোনিবেশের সাথে আল্লাহর আজমত- বড়োত্ব, রহমত-মাগফিরাত ইত্যাদির কথা ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করুন। বেশি বেশি দোয়া-দরুদ পড়ুন। তালবিয়া পড়ুন।[৪] তালবিয়া কোনো উঁচু জায়গায় ওঠার সময়, নিচু জায়গায় নামার সময়, বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময়, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসার সময়, কারও কাছে বেড়াতে গেলে সশব্দে তালবিয়া পড়ুন। কুরআন তিলাওয়াত করুন। হজ-উমরা বিষয়ক বই-পুস্তক পড়ুন। কোনো হক্কানি আলেম আলোচনা করতে থাকলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

---

[১] - দেখুন বোখারি : হাদিস নং ১৪৬৪

[২] - আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন,' রাসূলুল্লাহ (স) কে আমার এই দু'হাত দিয়ে সুগন্ধিত করেছি, যখন তিনি ইহরাম বেঁধেছেন ও যখন তিনি হালাল হয়েছেন – طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم و لحله حين أحل (বোখারি : হাদিস নং ১৬৩৫)

[৩]- দেখুন বোখারি : হাদিস নং ১৪২৯

[৪] উমরার জন্য ইহরাম হলে উমরার তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন। আর হজের ইহরামের সময় ১০ যিলহজ বড় জামরায় প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের শুরুতে তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন।

● পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করুন। বিমানে আরোহণরত অবস্থায় সালাতের সময় হলে একাকীই সালাত আদায় করে নিন। ওজু না থাকলে তায়াম্মুম করুন। সালাত কাজা করার অপেক্ষায় থাকবেন না।

● ৮ জিলহজ এহরাম বাধার পর যেহেতু মূল হজ শুরু হবে তাই এহরাম খোলা পর্যন্ত নিজেকে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করুণ। অন্যান্য হাজিদেরকেও নসিহত করুন, যেন সবাই তাওবা ইস্তিগফারের মধ্যে সময় কাটায়। যারা হজের কার্যক্রম সম্পর্কে অজ্ঞ তাদেরকে আপনি যতটুকু জানেন সেইটুকু বলুন। হজ পালনের জন্য সহিহ-শুদ্ধ কোনো বই সাথে থাকলে তা পড়ে শুনান। এভাবে পুরা সময়টাকে ঈমানি ভাবগাম্ভীর্যের আওতায় কাটান।

এহরাম ও তালবিয়া

তালবিয়ার মাধ্যমেই কার্যত হজ ও উমরায় প্রবেশের ঘোষণা দেয়া হয়। সে হিসেবে তালবিয়াকে হজের স্লোগান বলা হয়েছে[১] তালবিয়ার শব্দমালা নিম্নরূপ—

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكْ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكْ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكْ ، لا شَرِيْكَ لَكْ

'আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। তোমার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোনো শরিক নেই।'[২] ইবনে ওমর বলেন: 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ-শব্দমালায় আর কিছু বাড়াতেন না' আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর বর্ণনা মতে তালবিয়ায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ 'আমি হাজির সত্য ইলাহ আমি হাজির'।[৩]

এক আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজিরা দেয়া, ও তাঁর লা-শরিক হওয়ার ঘোষণা বার বার উচ্চারিত হয় তালবিয়ার শব্দমালায়। তালবিয়া যেন সকল পৌত্তলিকতা, প্রতিমা-পূজা, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার সমীপে হীনতা দীনতা প্রকাশের বিরুদ্ধে এক অমোঘ ঘোষণা যা নবী-রাসূল পাঠানোর পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত। যে ঘোষণার সার্থক রূপায়ণ ঘটতে দেখা যায় রাসূলুল্লাহর (ﷺ) শিরক ও মুশরিকদের সকল কর্মকাণ্ড থেকে দায়-মুক্তি ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা পড়ে শোনানোর মাধ্যমে।

শুধু তালবিয়া নয় বরং অন্যান্য হজকর্মেও তাওহীদ চর্চা প্রচণ্ডভাবে দৃশ্যমান। তাওয়াফ শেষে যে দু'রাকাত সালাত আদায় করতে হয় সেখানেও তাওহীদ চর্চার বিষয়টি প্রকাশমান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ দু রাকাত সালাত আদায়ের সময় 'সূরা ইখলাস' ও 'সূরা আল-কাফিরুন' পাঠ করেছেন,[৪] এ দুটি সূরাতে তাওহীদের বাণী স্পষ্ট আকারে উচ্চারিত হয়েছে। জাবের (রা) বলেন: "তিনি (ﷺ) এ-দু'রাকাতে তাওহীদভিত্তিক সূরা ও 'কুল য়্যা আইয়ুহাল কাফিরুন' তিলাওয়াত করলেন"।[৫] অন্য এক বর্ণনায় তিনি ইখলাসের দুই সূরা ''কুল য়্যা আইয়ুহাল কাফিরুন' ও 'কুল হুআল্লাহু আহাদ', তিলাওয়াত করেন"।[৬]

সাফা ও মারওয়ায় তাওহীদনির্ভর দোয়া একত্ববাদের সাথে হজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে নির্দেশ করে। জাবেরের (رضي الله عنه) এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফায় আরোহণ করলেন, কাবা দৃষ্টিগ্রাহ্য হল, তিনি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্বের কথা বললেন, তাঁর বড়োত্বের ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন—

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, ও শত্রু দলকে একাই পরাভূত করেছেন।' মারওয়াতে গিয়েও তিনি অনুরূপ করলেন।[৭]

আরাফার দোয়া ও রিজিকসমূহেও তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদিসে এসেছে, 'উত্তম দোয়া আরাফা দিবসের দোয়া, আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের সর্বোত্তম কথাটি হলো:

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

---

[১] - ইবনু খুযাইমাহ : হাদিস নং ২৬২৮
[২] - বোখারি : হাদিস নং ৫৪৬০
[৩] - ইবনে মাযাহ : হাদিস নং ২৯২০
[৪] - আবু দাউদ : হদীস নং ১৯০৯
[৫] - আবু দাউদ : হাদিস নং ১৯১৯
[৬] - তিরমিযী : হাদিস নং ৮৬৯
[৭] - মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।'[১]

হজকারীদের—এমন কি ব্যাপকার্থে—মুসলমানদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে বিচিত্র ধরনের বেদআত, কুসংস্কার ও শিরকের ধূম্রজালে জড়িয়ে রয়েছে অনেকেই। এই জন্য ওলামা ও আল্লাহর পথে আহ্বায়কদের উচিত তালবিয়ার ভাব ও আদর্শ হাজি সাহেবদেরকে বেশি বেশি বলা। তালবিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী সবাইকে জীবন গড়তে উৎসাহিত করা।

তালবিয়া পাঠের হুকুম

তালবিয়া হজের স্লোগান। তাই তালবিয়া পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তালবিয়া পাঠ ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নত এই নিয়ে ফেকাহবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। হানাফি মাজহাব অনুযায়ী এহরাম বাধার সময় তালবিয়া অথবা অন্য কোনো জিকির একবার পাঠ করা ফরজ, এবং একাধিকবার পাঠ করা সুন্নত।

উমরার ক্ষেত্রে তালবিয়ার শুরু এহরামের নিয়ত করার সময় থেকে এবং শেষ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করার সময়ে। আর হজের ক্ষেত্রে এহরামের নিয়ত করার সময় থেকে ১০ জিলহজ বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত আরবি শব্দমালা ব্যবহার করে তালবিয়া পড়া সুন্নত। তবে যদি কেউ আল্লাহর আজমত ও বড়োত্ব প্রকাশক আরো কিছু শব্দ এর সাথে যুক্ত করতে চায় তাহলে তা জায়েয হবে। যেমনটি করেছেন ওমর (رضي الله عنه)। তিনি উল্লেখিত তালবিয়ার শব্দমালা পড়ার পর বলতেন।[২]

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرَ فِيْ يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

'আমি হাজির হে আল্লাহ আমি হাজির, আমি হাজির একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টি কল্পে। কল্যাণ তোমার হাতে, আমল ও প্রেরণা তোমারই কাছে সমর্পিত।'

তবে আমাদের উচিত হবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাদের ব্যবহৃত শব্দমালার বাইরে না যাওয়া।

যদি কেউ আরবি তালবিয়া আদৌ উচ্চারণ করতে না পারে, তাহলে বাংলা ভাষায় তালবিয়ার অনুবাদ মুখস্থ করে পড়লেও দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে যেহেতু আরবি তালবিয়াটিই হজের শেয়া'র বা স্লোগান তাই হজ পালনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত হবে মেহনত করে শুদ্ধভাবে আরবি তালবিয়াটি শিখে নেয়া।

তালবিয়া মুখে উচ্চারণ করা জরুরি। যদি কেউ মনে মনে তালবিয়া পড়ে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাগণ মুখে উচ্চারণ করে উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়েছেন। হাদিসে এসেছে, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে বের হলাম হজের তালবিয়া চিৎকার করে বলে বলে।[৩] আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হজ বিষয়ে নির্দেশ করে বলেছেন, ' لِتَأْخُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُم – আমার কাছ থেকে তোমরা যেন তোমাদের হজকর্মসমূহ জেনে নাও।' তালবিয়ার ক্ষেত্রে সশব্দে উচ্চারণ করে পড়া ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি আমাদের জানা নেই, তাই সশব্দে উচ্চারণ করে তালবিয়া না পড়লে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আদর্শের অনুসরণ হবে না।

বর্তমানে দেখা যায় যে হাজি সাহেবদের মধ্যে একজন প্রথমে তালবিয়ার কিছু শব্দ উচ্চারণ করেন, পরে অন্যান্য হাজিগণ তাকে অনুসরণ করে সমস্বরে তালবিয়া পড়েন। এভাবে একবার তালবিয়া শেষ হলে আবার শুরু করেন। এরূপ করা সুন্নতের বিপরীত। তালবিয়া পাঠের সময় সুন্নত তরিকা হল প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা তালবিয়া পাঠ করবে। হ্যাঁ যদি তালবিয়া শেখানোর প্রয়োজনে সাময়িকভাবে তালকিন করা হয়, তবে তার অনুমতি রয়েছে।

নারীদের জন্য জোরে তালবিয়া পড়া নিষিদ্ধ। নারীরা এতটুকু শব্দে তালবিয়া পাঠ করবেন যাতে পাশে থাকা সঙ্গিনী কেবল শুনতে পান। কোন বেগানা পুরুষ শুনতে পায় এমন উচ্চারণে নারীদের তালবিয়া পাঠ অবৈধ।

তালবিয়া বেশি বেশি পড়া মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, চলন্ত অবস্থায়, ওজু ও বে-ওজু—সর্বাবস্থায় তালবিয়া পড়া যায়। বিশেষ করে ব্যক্তির অবস্থা পরিবর্তনের সময় তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব। যেমন দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসার সময়, বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময়, ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, গাড়িতে উঠার সময়, গাড়ি থেকে নামার সময় তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব। মসজিদুল হারাম, মিনার মসজিদে খাইফ, আরাফার মসজিদে নামিরায় তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব। তবে মসজিদে নিচু স্বরে তালবিয়া পাঠ বাঞ্ছনীয়।

---

[১] - তিরমিযি, হাদিস নং ৩৫৮৫, মুহাদ্দীস আলবানী এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, দ্রঃ সহিহ সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং ২৮৩৭

[২] - মুসলিম : হাদিস নং ১১৮৪

[৩] - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا (মুসলিম : হাদিস নং ২১৯০)

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

হজ ও উমরার উদ্দেশে এহরামের ফলে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া বিষয়ের তিন অবস্থা।

১. নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ।

২. কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ।

৩. কেবল নারীর ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ।

নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয় সাত প্রকার।

প্রথমত: মুণ্ডন কিংবা অন্য কোন উপায়ে মাথার চুল ফেলে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কালামে স্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে মাথার চুল ফেলে দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কুরআনে এসেছে—

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

অর্থ: যে পর্যন্ত না হাদি'র পশু তার স্থানে পোঁছায়, তোমরা মাথা মুণ্ডন কর না।[১][২]

অসুস্থতা কিংবা মাথায় উকুন জনিত যন্ত্রণার ফলে যে ব্যক্তি মাথার চুল ফেলতে বাধ্য হবে, তার প্রদেয় ফিদয়া সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে—

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

অর্থ: তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ হবে, কিংবা যার মাথায় যন্ত্রণা থাকবে, (এবং চুল ফেলতে বাধ্য হবে) সে যেন সিয়াম বা সদকা অথবা পশু জবাই দ্বারা ফিদয়া প্রদান করে।[৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বিষয়টি বিশদ করেছেন এভাবে—

কাব বিন আজরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি রাসূলের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার মুখে উকুন ঝরে পড়ছিল। দেখে রাসূল বললেন :

ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أ تجد شاةً ؟

তুমি এতটা কষ্ট পাচ্ছ এটা আমার ধারণা ছিল না। তোমার কাছে কোন বকরি আছে ? আমি বললাম, না। অত:পর নাজিল হল—

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

তবে সিয়াম, বা সদকা অথবা কোরবানি দ্বারা ফিদয়া প্রদান করবে।[৪] তিনি বলেন: তা হচ্ছে তিন দিন রোজা রাখা, কিংবা ছয় জন মিসকিনকে আহার করানো। প্রতি মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' খাবার।[৫]

এ হাদিস ফিদয়া সংক্রান্ত আয়াতকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে পূর্ণভাবে। স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে উল্লেখিত আয়াতের সিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে তিন। সদকার পরিমাণ হচ্ছে ছয় জন মিসকিনের জন্য তিন সা'। প্রতি মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' (অর্থাৎ এক কেজি বিশ গ্রাম)। পশু জবাইয়ের ইচ্ছা করলে বকরির চেয়ে বড় যে কোন পশু জবেহ করে দেবে। এ তিনটির যে কোন একটি ফিদয়া হিসেবে প্রদানের সুযোগ রয়েছে। আয়াতটি এ ব্যাপারে উত্তম দলিল। কুরআন ও সহিহ হাদিসের স্পষ্ট প্রামাণ্যতার ফলে এ ব্যাপারে পিছ-পা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। অধিকাংশ শরিয়তবিদ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। পশু জবাই করে ফিদয়ার ক্ষেত্রে এমন বকরি হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা কোরবানির উপযুক্ত। পশুটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাবতীয় ত্রুটি হতে মুক্ত হতে হবে। আলেমগণ একে 'ফিদয়াতুল আযা' হিসেবে অভিহিত করেছেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা একে পবিত্র কুরআনে أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ বলে বর্ণনা করেছেন।[৬]

মস্তক ব্যতীত দেহের অন্য কোন স্থানের লোম মুণ্ডন করলে বিজ্ঞ আলেমগণের ইজতিহাদ অনুযায়ী বিষয়টি নানারূপে বিভক্ত হবে। কিছু ক্ষেত্রে ফিদয়া প্রদান করতে হবে, কিছু ক্ষেত্রে দিতে হবে দম। কারণ, মাথা মুণ্ডন করার ফলে যেমন

---

[১] কেরান ও তামাত্তুকারী শুকরিয়া স্বরূপ যে পশু জবেহ করে তাকে 'হাদি' বলে।

[২] সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৯৬

[৩] সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৯৬

[৪] সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৯৬

[৫] বোখারি, মুসলিম

[৬] খালেছুল জুমান : ৭৭

পরিচ্ছন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব হয়, তেমনি দেহের লোম ফেললেও এক প্রকার স্বস্তি অনুভূত হয়। তাই উভয়টিকে একই হুকুমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।[১]

দ্বিতীয়ত: নখ উপড়ে ফেলা, কর্তন করা কিংবা ছাঁটা—চুল মুণ্ডন করার হুকুমের ভিত্তিকে—ইত্যাদি এহরাম অবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য হারাম। ইবনে মুনযির বলেন: আলেমগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, নখ কাটা মুহরিমের জন্য হারাম। হাত কিংবা পায়ের নখ—উভয়ের ক্ষেত্রেই একই হুকুম। তবে, যদি নখ ফেটে যায় এবং তাতে যন্ত্রণা হয় তবে যন্ত্রণাদায়ক স্থানটিকে ছেঁটে দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। এ কারণে কোন ফিদয়া ওয়াজিব হবে না।[২]

তৃতীয়ত: এহরাম বাধার পর শরীর, কাপড় কিংবা এ দুটির সাথে সম্পৃক্ত অন্য কিছুতে আতর ব্যবহার করা। ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত হাদিস দ্বারা জানা যায় মুহরিমের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন

لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس

জাফরান কিংবা ওয়ারাস (এক জাতীয় সুগন্ধি) মিশ্রিত কাপড় পরিধান করবে না।[৩] অপর এক হাদিসে তিনি আরাফায় অবস্থান কালে বাহনে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণকারী এক সাহাবি সম্পর্কে এরশাদ করেন:

لا تقربوه طيبا

তোমরা তার কাছে আতর নিয়ো না।[৪] অপর রেওয়ায়েতে এসেছে

ولا يمس طيبا

আতর স্পর্শ করো না।[৫] এর কারণে উল্লেখ করে তিনি বলেন:

فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

কারণ, কেয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তার পুনরুত্থান ঘটবে।[৬] মুহরিমের জন্য বৈধ নয় সুগন্ধি গ্রহণ, পানীয়ের সাথে জাফরান মিশ্রিত করা যা পানীয়ের স্বাদে ও গন্ধে প্রভাব সৃষ্টি করে, অথবা চায়ের সাথে এতটা গোলাপ জল মিশ্রণ করা, যা তার স্বাদে ও গন্ধে পরিবর্তন ঘটায়। মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি মিশ্রিত সাবান ব্যবহার করবে না।[৭] এহরামের পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধিতে কোন সমস্যা নেই। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে,

كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

এহরাম অবস্থাতেই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তকের সিঁথিতে মেশকের উজ্জ্বলতার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলাম।[৮]

চতুর্থত: জমহুর ওলামার মতানুসারে বিবাহ এহরাম অবস্থায় অবৈধ। কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন : মুহরিম বিবাহ করবে না, বিবাহ দেবে না এবং প্রস্তাবও পাঠাবে না।[৯]

সুতরাং, কোন মুহরিমের পক্ষে বৈধ নয় বিয়ে করা, কিংবা অলি ও উকিল হয়ে কারো বিয়ের ব্যবস্থা করা অথবা এহরাম হতে মুক্ত হওয়া অবধি কাউকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো। এমনিভাবে নারী মুহরিমের জন্যও একই হুকুম। সে কোন পুরুষকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পারবে না।

পঞ্চমত: এহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য সহবাস অবৈধ। শরিয়তবিদদের মাঝে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, এহরাম অবস্থায় অবৈধ বিষয়গুলোর মাঝে কেবল সহবাস হজকে নষ্ট করে দেয়। কুরআনে বর্ণিত আয়াত,

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(যে এই মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে, তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।) [১০]

আয়াতে উল্লেখিত الرفث শব্দটি একই সাথে সহবাস ও সহবাস জাতীয় যাবতীয় বিষয়কেই সন্নিবেশ করে। এহরামের অবৈধ বিষয়গুলোর মাঝে সহবাসই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিকর অনিষ্টকারী। এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে:

---

[১] খালেছুল জুমান : ৮৩
[২] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ : ৪৪
[৩] ফতহুল বারি : ৪/১৮১
[৪] মুসলিম : ৪/৩৮৮
[৫] মুসলিম : ৪/৩৮৭
[৬] প্রাগুক্ত : ৪/৩৮৮
[৭] মানসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা : ৪৭
[৮] বোখারি : ১৪৩৮
[৯] মুসলিম : ৫/২০৯
[১০] সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৯৭

প্রথম অবস্থা : ওকুফে আরাফার পূর্বে মুহরিম ব্যক্তির স্ত্রী-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া। আলেমদের কারো মাঝেই এ ব্যাপারে বিরোধ নেই যে, এর মাধ্যমে তার হজ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে তার কর্তব্য হচ্ছে, আরম্ভ করা হজটি সমাপ্ত করা, এবং পরবর্তীতে তা কাজা করা। তাকে হাদী (পশু কোরবানি) দিতে হবে। পশুটি কেমন হবে এ ব্যাপারে জমহুরের মত হচ্ছে তার কর্তব্য একটি উট জবেহ করা। ।[১]

দ্বিতীয় অবস্থা: ওকুফে আরাফার পরে, জামরায়ে আকাবা ও তাওয়াফে এফাদার পূর্বে যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আহমদসহ জমহুর ফুকাহাদের মতে তার হজ ফাসেদ হিসেবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় তার উপর দুটি হুকুম আরোপিত হবে। এক: তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে। সে ফিদয়া আদায় করতে হবে একটি উট বা গাভি দ্বারা, যা কোরবানি করার উপযুক্ত। এবং সব গোশত মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে, নিজে কিছুই গ্রহণ করবে না। দ্বিতীয়: সহবাসের ফলে হজটি নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। তবে নষ্ট হজটিই পূরণ করা তার কর্তব্য এবং বিলম্ব না করে পরবর্তী বছরেই নষ্ট হজটির কাজা আদায় করতে হবে। ইমাম মালেক তার রচিত মুআত্তায় বলেন: 'আমি জানতে পেরেছি যে, উমর, আলী এবং আবু হুরায়রা রা.-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে মুহরিম থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। তারা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, তারা আপন গতিতে হজ শেষ করবে। এবং পরবর্তী বছরে হজ আদায় করবে এবং কোরবানি প্রদান করবে।[২]

তিনি বলেন, আলী রা. বলেছেন: পরবর্তী বছর যখন তারা হজের এহরাম বাঁধবে, তখন হজ শেষ করা অবধি একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে।[৩]

তৃতীয় অবস্থা: যদি জামরায়ে আকাবা আদায়ের পর এবং তাওয়াফে এফাদার পূর্বে সহবাস সংঘটিত হয়, তবে সকলের মতানুসারেই তার হজটি শুদ্ধ। মোটকথা, সর্বসম্মত মত হল ওকুফে আরাফার পূর্বে সহবাস হজকে বিনষ্ট করে দেয়। জামরায়ে আকাবার পর এবং তাওয়াফে এফাদার পূর্বে যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও সকলের ঐক্যমত হল হজ নষ্ট হবে না। যদি ওকুফে আরাফার পর এবং জামরার পূর্বে সহবাস হয়, জমহুর আইম্মার মতে হজ নষ্ট হয়ে যাবে। এহরাম বিরোধী অন্যান্য বিষয়গুলো হজকে সমূলে নষ্ট করবে না।[৪]

দ্বিতীয় অবস্থা: জামরায়ে আকাবা ও মস্তক মুণ্ডনের পর এবং তাওয়াফে এফাদার পূর্বে যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে হজটি শুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রসিদ্ধ মতানুসারে তার উপর দুটি বিষয় ওয়াজিব হবে।

১. একটি বকরি দ্বারা ফিদয়া প্রদান করা যার সমুদয় গোশত গরিব মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হবে। ফিদয়া দানকারী কিছুই গ্রহণ করবে না।

২. হাজি এহরামের এলাকার বাইরে গমন করবে এবং নতুন করে এহরাম বাঁধবে এবং মুহরিম অবস্থায় তাওয়াফে এফাদার জন্য ইজার ও চাদর পড়ে নিবে।[৫]

এহরাম অবস্থায় কামোত্তেজনাসহ স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা নিষিদ্ধ। যেমন চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি। কুরআনে এসেছে,

مَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

অর্থ: যে এই মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে নিল, তার জন্য হজের সময়ে যৌন-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।[৬]

আয়াতে উল্লেখিত الرفث শব্দটি একই সাথে নানা অর্থের সন্নিবেশ করে। ১. সহবাস—ইতিপূর্বে আমরা এর সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছি। ২. সহবাস পূর্ব মেলামেশা—যেমন কামোত্তেজনার সাথে চুম্বন, স্পর্শ ও আমোদ ইত্যাদি। সুতরাং মুহরিমের পক্ষে কামোত্তেজনার সাথে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন, স্পর্শ আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি কোনভাবেই বৈধ নয়। এমনিভাবে, মুহরিম অবস্থায় স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সুযোগ করে দেয়াও বৈধ নয়। কামভাব নিয়ে স্ত্রীর প্রতি নজর করাও নিষিদ্ধ, কারণ, এর মাধ্যমে সহবাসের অনুরূপ সম্ভোগ হয়। ৩. সহবাস সম্পর্কিত কথপোকথন—যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমরা এহরাম থেকে মুক্ত হয়ে এমন এমন করব।[৭]

আয়াতে উল্লেখিত الفسوق শব্দটি একই সাথে আল্লাহর আনুগত্যের যাবতীয় অনুষঙ্গ থেকে নিজেকে প্রত্যাহারকে বুঝায়।[৮]

---

[১] খালেছুল জুমান : ১১৪
[২] মুআত্তা মালেক : ১৩০৭/১
[৩] প্রাগুক্ত
[৪] খালেছু জুমান : ১১৪
[৫] মানাসিকুল হাজ্জা ওয়াল উমরা : ৪৯
[৬] সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৯৭
[৭] খালেছুল জুমান : পৃ : ৭৬
[৮] খালেছুল জুমান : ৭৬

সপ্তম: এহরাম অবস্থায় শিকার অবৈধ। হজ কিংবা উমরা—যে কোন অবস্থাতেই মুহরিমের জন্য স্থলজ প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ—এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। তবে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে এমন সব প্রাণীর ক্ষেত্রে যার গোশত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়, এবং যা বন্য প্রাণী-ভুক্ত। উক্ত 'শিকার'-এর সংজ্ঞা হল এমন সব প্রাণী যা স্থলজ, হালাল, এবং প্রাকৃতিকভাবেই বন্য, যেমন হরিণ, হরিণ-শাবক, খরগোশ, কবুতর ইত্যাদি। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন—

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

অর্থ: যতক্ষণ তোমরা এহরামে থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম।[১] অপর স্থানে এসেছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

অর্থ: হে মুমিনগণ! এহরামে থাকাবস্থায় তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না।[২]

সুতরাং, শিকার-জন্তু এহরাম অবস্থায় হত্যা করা বৈধ নয়। একই রূপে উল্লিখিত ধরনের জন্তু হত্যার ক্ষেত্রে কারণ হওয়াও নিষিদ্ধ, যেমন দেখিয়ে দেয়া, ইশারা করা, বা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে হত্যায় সহযোগিতা করা।

আবু কাতাদা হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে—তিনি কতিপয় সাহাবির সাথে ছিলেন, যারা ছিলেন মুহরিম, পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন হালাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাদের সম্মুখে। আবু কাতাদা জুতো সেলাইয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারা তাকে অবহিত করেননি। তারা চাচ্ছিলেন যেন তিনি তা দেখতে পান। তিনি তা দেখতে পেলেন এবং ঘোড়ার লাগাম ধরলেন। অত:পর ঘোড়ায় চড়লেন কিন্তু ভুলে তীর-ধনুক রেখে গেলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাকে তীর ধনুক দাও। তারা উত্তর করল: আমরা, আল্লাহর কসম! তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে নেমে এলেন এবং তীর-ধনুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন ও গাধার উপর আক্রমণ করলেন। অত:পর জংলি গাধাটিকে জবেহ করে নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে সেটি মরে গিয়েছিল। সকলে আহার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল...।[৩]

শিকার করা জন্তু দ্বারা আহার গ্রহণের তিন হুকুম।

প্রথমত: এমন জন্তু যা মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করেছে কিংবা হত্যায় শরিক হয়েছে। এমন জন্তু খাওয়া মুহরিম ও অন্য সকলের জন্য হারাম।

দ্বিতীয়ত: মুহরিমের সাহায্য নিয়ে কোনো হালাল ব্যক্তি যে জন্তুকে হত্যা করেছে, যেমন মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখিয়ে দিয়েছে, অথবা শিকারের অস্ত্র এগিয়ে দিয়েছে—এমন জন্তু কেবল মুহরিমের জন্য হারাম—অন্য সকলের জন্য হালাল।

তৃতীয়ত: হালাল ব্যক্তি যে জন্তু মুহরিমের জন্য হত্যা করেছে। এমন জন্তুও মুহরিমের জন্য হারাম। অন্য সকলের জন্য হালাল। কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم

অর্থ: স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হালাল যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা তা শিকার কর, কিংবা তোমাদের উদ্দেশে শিকার করা হয়।[৪]

আবু কাতাদা হতে বর্ণিত, তিনি একটি জংলি গাধা শিকার করলেন। আবু কাতাদা মুহরিম ছিলেন না। তার সঙ্গীরা সকলেই মুহরিম ছিলেন। সকলে তা হতে আহার গ্রহণ করেছিল। পরে তাদের আহারের ব্যাপারে মতানৈক্য হল। এ ব্যাপারে তারা রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন: কেউ কি ইঙ্গিত করেছে বা কোন কিছুর নির্দেশ দিয়েছে? তারা উত্তর করল: না। তিনি বললেন: তবে তোমরা খাও।[৫]

মুহরিম ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করে, তবে এর জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছে,

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا

[১] সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৬
[২] সুরা মায়েদা, আয়াত : ৯৫
[৩] মুসলিম : ৪/৩৬৩
[৪] আবু দাউদ : ১৮৫১, তিরমিজি : ৫/১৮৭
[৫] বোখারি : ১৭২৫, মুসলিম : ১১৯৬

অর্থ: তোমাদের মাঝে কেউ তা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মাঝে দুজন ন্যায়বান লোক, কাবায় প্রেরণ করা হাদী (কোরবানি) রূপে। কিংবা তার কাফফারা হচ্ছে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা অথবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা।[১]

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি কবুতর হত্যা করে তবে তার বিনিময় হচ্ছে একটি বকরি জবেহ করা, কবুতরের ফিদয়া স্বরূপ যা দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেবে। কিংবা বকরির মূল্য নির্ধারণ করে সমপরিমাণ খাদ্য মিসকিনদের দিয়ে দেবে। (যতজন মিসকিনকে সম্ভব) প্রতি মিসকিনকে অর্ধ সা' আহার প্রদান করবে। অথবা প্রতি মিসকিনের খাদ্যের পরিবর্তে একদিন রোজা রাখবে। এ তিন পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন ইচ্ছাধিকার থাকবে।[২]

পক্ষান্তরে ক্ষতিকর পোকা-মাকড় কিংবা হিংস্র প্রাণীকে শিকার-জন্তু হিসেবে গণ্য করা হবে না। সুতরাং হারাম এলাকা কিংবা অন্য যে কোন স্থানে মুহরিম বা হালাল, সকলের জন্য তা হত্যা করা বৈধ। প্রমাণ: আবু সাইদ খুদরি হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমের জন্য হত্যা-বৈধ প্রাণীর উল্লেখ করে বলেন: সাপ, বিচ্ছু, ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ—আর কাককে ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেবে, হত্যা করবে না—লোলুপ কুকুর, মাংসাশী পাখি, হিংস্র পশু।[৩]

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হারাম, কিংবা হালাল উভয় এলাকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যার বৈধতা প্রদান করেছেন, কাক, মাংসাশী পাখি, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং লোলুপ কুকুর। ভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে 'সাদা কাক'।[৪]

ইবনে মাসউদের হাদিসও এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ্য, তিনি বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এক মুহরিমকে সাপ হত্যার অনুমতি প্রদান করেছেন।[৫]

এহরামের কারণে বৃক্ষ কর্তন মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কারণ, এতে এহরামে কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি হয় না। তবে তা যদি হারামের নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে হয়, তবে মুহরিম হোক কিংবা হালাল—সকলের জন্য হারাম। এই মৌলনীতির ভিত্তিতে আরাফায় মুহরিম কিংবা হালাল, উভয়ের জন্য বৃক্ষ কর্তন বৈধ; মুযদালেফা ও মিনায় অবৈধ। কারণ, আরাফা হারামের বাইরে, মুযদালেফা ও মিনা হারামের সীমা-ভুক্ত।

এ সাতটি এহরাম বিরোধী বিষয় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য হারাম।

বিশেষভাবে পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ আরো দুটি বিষয় রয়েছে, তা নিম্নরূপ:

১. মাথা আবৃত করা। কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফায় বাহনে পিষ্ট মুহরিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরশাদ করেন : তাকে পানি ও বড়ই পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং তার দুই কাপড় দ্বারা কাফন পরাও এবং তার মস্তক আবৃত করো না।[৬] ভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে—

لا تخمروا رأسه و لا وجهه.

তার মস্তক ও মুখমণ্ডল আবৃত করো না।[৭]

সুতরাং, পুরুষ মুহরিমের জন্য পাগড়ি, টুপি ও রুমাল জাতীয় কাপড় দিয়ে মস্তক আবৃত করা বৈধ নয়, যা তার দেহের সাথে লেগে থাকে। এবং মুসলিমের বর্ণনা মোতাবেকে মুখও আবৃত করা বৈধ নয়। আর যা মস্তকের সাথে লেগে থাকে না; যেমন ছাতা, গাড়ির হুড, তাঁবু ইত্যাদি ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। প্রমাণ: উম্মে হাসিন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলের সাথে হজ পালন করলাম- যখন তিনি আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। অত:পর তিনি বাহনে চড়ে প্রত্যাবর্তন করলেন, তার সাথে ছিলেন বেলাল ও উসামা। তাদের একজন বাহন চালাচ্ছিলেন, অপরজন রাসূলের মস্তকের উপরে কাপড় উঁচিয়ে রেখেছিলেন, যা তাকে সূর্য থেকে ছায়া দিচ্ছিল।[৮]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তাকে তাপ হতে ঢেকে রাখছিল, যতক্ষণ না তিনি আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ সমাপ্ত করলেন।

মাথায় আসবাব-পত্র বহন করা অবৈধ নয়, যদিও তা মাথার কিছু অংশ ঢেকে ফেলে। কারণ, সাধারণত এর মাধ্যমে কেউ মাথা আবৃত করার উদ্দেশ্য করে না। পানিতে ডুব দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও তা মাথাকে সম্পূর্ণ আবৃত করে নেয়।

২. স্বাভাবিক অবস্থায় যে পোশাক পরিধান করা হয়, তা পরিধান পুরুষের জন্য বৈধ নয়। হোক তা জোব্বার মত পুরো শরীর ঢেকে নেয়ার মত পোশাক কিংবা পাজামার মত অর্ধাঙ্গ ঢাকে এমন পোশাক। প্রমাণ: উমর রা. বর্ণিত হাদিস—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহরিমের পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন : সে জামা, পাগড়ি,

---

[১] সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৫

[২] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা : ৫১

[৩] তিরমিজি : ৮৩৮

[৪] খালেছুল জুমান, ফতহুল বারি : খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫১১, শরহে মুসলিম : খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭২

[৫] শরহে মুসলিম : খন্ড ৭, পৃষ্ঠা : ৪৯১

[৬] শরহে মুসলিম : খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৭

[৭] মুসলিম : ৪/৫৪৩

[৮] মুসলিম : ২২৮৭

ঝুল কোট, পাজামা, মোজা এবং এমন কাপড় পরিধান করতে পারবে না, যাতে জাফরান ও ওয়ারাস (এক প্রকার সুগন্ধি) ব্যবহার করা হয়েছে।[১]

তবে, যদি ইজার ক্রয় করার মত টাকা না থাকে, তবে পাজামাই পরিধান করে নিবে। এবং জুতো কেনার মত সংগতি না থাকলে মোজা পরে নিবে, সাথে অন্য কিছু পরিধান করবে না। প্রমাণঃ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফার ময়দানে খুতবা প্রদান করতে শুনেছি, তিনি বলছেন : যে ইজার পাবে না, সে যেন পাজামা পরে নেয়। যে জুতো পাবে না, সে যেন মোজা পরে নেয়।[২]

পরিধান ব্যতীত জামা শরীরের সাথে কেবল পেঁচিয়ে রাখাতে কোন দোষ নেই।

স্বাভাবিক অবস্থায় ঝুল জামা যেভাবে পরিধান করা হয়, সেভাবে পরিধান না করে চাদর হিসেবে ব্যবহারে কোন দোষ নেই।

জোড়া-তালি যুক্ত চাদর বা লুঙ্গি পরিধানে কোন বাধা নেই।

ইজারের উপর রশি বাধা নিষিদ্ধ নয়।

আংটি, হাত-ঘড়ি, চশমা, শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার বৈধ। গলায় পানির মশক এবং দান-পাত্র ঝুলাতে পারবে। যদি চাদর খুলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তা বেধে রাখতে পারবে, কারণ, এ সমস্ত বিষয়ে রাসূলের পক্ষ হতে কোন স্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিতসূচক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। কেবল যখন রাসূলকে মুহরিমের পরিধেয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ সে জামা, পাগড়ি, ঝুল কোট, পাজামা, এবং মোজা পরিধান করবে না।

পরিধেয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর যখন রাসূল পরিধানের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে জানালেন, তখন প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত পরিধেয় ছাড়া অন্য যাবতীয় পোশাক মুহরিম ব্যক্তি পরিধান করতে পারবে।

জুতো না থাকলে পায়ের সুরক্ষার জন্য তিনি মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা ব্যবহার বৈধতা প্রদান করেছেন। সুতরাং, এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, চোখের সুরক্ষার জন্য চশমা ব্যবহারও বৈধ।

শেষোক্ত নিষিদ্ধ বিষয় দুটো কেবল পুরুষের ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট। নারীর জন্য তার মস্তক আবৃত করে রাখতে পারবে, এবং এহরাম অবস্থায় যে কোন ধরনের পোশাকই পরতে পারবে। তবে, অত্যধিক সাজ-সজ্জা করবে না, হাত মোজা ব্যবহার করবে না। মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে না, তবে পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখবে। কারণ, মাহরাম ব্যতীত পর-পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা নারীদের জন্য বৈধ নয়। এহরামে পরিধান করা বৈধ, এমন যে কোন পোশাক নারী-পুরুষ উভয় মুহরিমই পরিবর্তন করে পরিধান করতে পারবে।

মুহরিম ব্যক্তি যদি উল্লেখিত সহবাস, শিকার হত্যা বা এ জাতীয় যে কোন একটি এহরাম বিরোধী কাজ করে, তবে এ ক্ষেত্রে তিন অবস্থা হবেঃ

প্রথমতঃ হয়তো সে তা ভুলে,[৩] না জেনে, বাধ্য হয়ে কিংবা নিদ্রিত অবস্থায় করবে। এ ক্ষেত্রে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। তার কোন পাপ হবে না, ফিদয়া ওয়াজিব হবে না, কিংবা তার হজও নষ্ট হবে না। কারণ, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

হে রব! আমরা যদি বিস্মৃত হই, কিংবা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।[৪] অপর স্থানে এসেছে

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা থাকলে অপরাধ হবে।[৫] ভিন্ন এক আয়াতে এসেছে

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

যে ঈমান আনার পর কুফুরে নিমজ্জিত হল, এবং কুফুরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখল, তার উপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে এবং তার জন্য আছে মহা-শাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফুরিতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার হৃদয় ঈমানে অবিচলিত।[৬]

---

[১] মুসলিম : ৪/৩৩১

[২] মুসলিম : ৪/৩৩১

[৩] এ ক্ষেত্রে এক দল উলামা, যাদের মাঝে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক রয়েছেন, বলেন, ভুল কিংবা বিস্মৃতি—উভয় ক্ষেত্রেই ফিদয়া ওয়াজিব হবে।

[৪] সূরা বাক্বারা, আয়াত : ২৮৬

[৫] সূরা আহযাব, আয়াত : ৫

[৬] সূরা নহল, আয়াত : ১০৬

বাধ্য করার পর যদি কুফুরির হুকুমই রহিত হয়ে যায়, তবে কুফুরি ব্যতীত অন্যান্য পাপের ক্ষেত্রে কী হুকুম হবে, তা সহজেই অনুমেয়। এ আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বাধ্য হয়ে কিংবা ওজরের কারণে যদি এহরামের নিষিদ্ধ বিষয় সংঘটিত হয়ে যায়, তবে হুকুমের আওতাভুক্ত হবে না। বরং, তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। শিকার হত্যা সংক্রান্ত নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন

مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

তোমাদের মাঝে কেউ তা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু।[১]

এ আয়াতে বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক ইচ্ছাকৃতভাবে করাকে শর্ত করেছেন। শাস্তি ও জামানত আরোপ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে করা শর্ত। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না করে, তবে তাকে বিনিময়ও দিতে হবে না, এবং সে পাপীও হবে না। তবে যখন ওজর দূরীভূত হবে, এবং অজ্ঞাত ব্যক্তি জ্ঞাত হবে, বিস্মৃত ব্যক্তি স্মরণ করতে সক্ষম হবে, নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হবে, তৎক্ষণাৎ তাকে নিষিদ্ধ বিষয় হতে নিজেকে মুক্ত করে নিতে হবে। ওজর দূর হওয়ার পরও যদি সে তাতে যুক্ত থাকে, তবে সে পাপী হবে, সন্দেহ নেই। এবং যথারীতি তাকে ফিদয়া প্রদান করতে হবে। উদাহরণতঃ ঘুমন্ত অবস্থায় মুহরিম যদি মাথা ঢেকে নেয়, তাহলে যতক্ষণ নিদ্রিত থাকবে, ততক্ষণ তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তার কর্তব্য হল মস্তক আবৃত করা। জেনে বুঝেও যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মস্তক আবৃত রেখে দেয়, তবে এ জন্য তাকে ফিদয়া প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে, কিন্তু ওজর সাপেক্ষে ঘটানো। এ ক্ষেত্রে তাকে ওয়াজিব প্রদেয় আদায় করতে হবে, এবং সে পাপী হবে না। প্রমাণঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

যে পর্যন্ত না কোরবানির পশু তার স্থানে উপনীত হয়, তোমরা মস্তক মুণ্ডন কর না। তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ হবে, কিংবা যার মস্তকে যন্ত্রণা থাকবে, (এবং চুল ফেলতে বাধ্য হবে) সে যেন সিয়াম বা সদকা অথবা কোরবানি দ্বারা ফিদয়া দেবে।[২]

তৃতীয়তঃ নিষিদ্ধ বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে, বৈধ কোন ওজর ব্যতীত সংঘটিত করা। এ ক্ষেত্রে তাকে প্রদেয় প্রদান করতে হবে, এবং পাপীও হবে।

ফিদয়া হিসেবে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রকারভেদ

ফিদয়া হিসেবে নিষিদ্ধ বিষয় চার ভাগে বিভক্তঃ যথা ১. যাতে কোন ফিদয়া নেই, তা হচ্ছে বিবাহের আকদ সংঘটিত হওয়া। ২. যার ফিদয়া একটি উট। তা হচ্ছে প্রথম হালালের পূর্বে হজ চলাকালীন সহবাস করা। ৩. যার ফিদয়া হচ্ছে বিনিময় বা সমতুল্য অন্য কিছু। যেমন শিকার হত্যা। ৪. যার ফিদয়া সিয়াম, সদকা, কিংবা কোরবানি। যেমন মস্তক মুণ্ডন। আলেমগণ প্রথম তিন প্রকারে উল্লেখিত নিষিদ্ধ বিষয় ছাড়া অন্য যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়কে চতুর্থটির সাথে সংযুক্ত করে দেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, ভুলবশত অথবা জবরদস্তিমূলক পরিস্থিতি, সকল অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে যে একটা কথা আছে তা কেবলই কেয়াস ও ধারণানির্ভর। যেমন বলা হয়েছে, ভুলবশত যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে তাকে দিয়াত আদায় করে ভুলের মাশুল দিতে হবে। যা প্রমাণ করে যে ভুল করে কোনো কাজ করে ফেললেও তাতে কাফফারা দিতে হবে। তবে কথা হল যে মানুষ হত্যা করা হক্কুল ইবাদ, মুয়ামালাতের ব্যাপার। আর মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে ভুল হলেও ভুলের মাশুল দিতে হয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে ভুলে গেলে ক্ষতিপূরণ না দেয়ার উদাহরণ হল ভুলবশত খেয়ে ফেললে

পবিত্র মক্কায় প্রবেশের বিবরণ

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যি-তাওয়া স্থানে–বর্তমানে জেরওয়াল এলাকার প্রসূতি হাসপাতালের জায়গা– গোসল করতেন। সে হিসেবে মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে গোসল করা মুস্তাহাব।[৩] মক্কায় হাজিদের বাসস্থানে গিয়ে গোসল করে নিলেও,

[১] সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৫
[২] সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৯৬
[৩] -ইমাম নববী : কিতাবুল ইযাহ ফি মানাসিকিল হজ্জে ওয়াল ওয়াল উমরা, পৃ : ১৯৪

কারও কারও মতে, এ মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে। কেননা মোটরযানে সফরের সময় গাড়ি থামিয়ে গোসল সেরে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয় না।

পবিত্র মক্কায় প্রবেশের সময় আল্লাহর আজমত ও বড়োত্বের কথা স্মরণ করুন। মনকে নরম করুন। আল্লাহর কাছে পবিত্র মক্কা যে কত সম্মানিত-মর্যাদাপূর্ণ তা স্মরণ করুন। পবিত্র মক্কায় থাকা অবস্থায় পবিত্র মক্কার যথাযথ মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করুন।

বর্তমান-যুগে মোটরযানে করে আপনাকে মক্কায় নেয়া হবে। আপনার বাসস্থানে যাওয়ার সুবিধা-মত পথে হজযাত্রীদেরকে নেয়া হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেদিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেছেন–কাদা পথ দিয়ে জান্নাতুল মুয়াল্লার এদিক থেকে[১] –আপনার জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। এ জন্য কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার গাড়ি সুবিধা-মত যে পথ দিয়ে যাবে সেখান দিয়েই যাবেন। আপনার বাসস্থানে মালপত্র রেখে উমরার জন্য প্রস্তুতি নেবেন।

উমরা আদায়ের পদ্ধতি

তালবিয়া পড়ে-পড়ে পবিত্র কাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। পবিত্র কাবার চার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদুল হারামের উঁচু বিল্ডিং। এ বিল্ডিংটির যে কোনো দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন। প্রথমে ডান পা এগিয়ে দিন। আল্লাহ যেন আপনার জন্য তাঁর রহমতের সকল দরজা খুলে দেন সে আকুতি নিয়ে মসজিদে প্রবেশের দোয়াটি পড়ুন। সম্ভব হলে নীচের দোয়াটি পড়ুন।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফির লি যুনুবি ওয়াফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিক্।

অর্থ: আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওপর। হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিন।

এরপর আপনার কাজ হবে তাওয়াফ শুরু করা। বায়তুল্লাহ শরীফ দেখামাত্র দু'হাত উঠানোর ব্যাপারে যে একটি কথা আছে তা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।[২] তবে বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টির আওতায় এলে দোয়া করার অনুমতি রয়েছে। ওমর (رضي الله عنه) যখন বায়তুল্লাহর দিকে তাকাতেন তখন নীচের দোয়াটি পড়তেন—

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ [৩]

যথার্থভাবে তাওয়াফ সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখুন—

১. ছোট-বড় সকল প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করা।

২. তাওয়াফের শুরুতে মনে মনে নিয়ত করা। এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেই চলবে। বিভিন্ন পুস্তকে তাওয়াফের যে নিয়ত লেখা আছে তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৩. সতর ঢাকা অবস্থায় তাওয়াফ করা।

৪. হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন-স্পর্শ) অথবা ইশারা করে তাওয়াফ শুরু করা এবং হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে তাওয়াফ শেষ করা।

৫. হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে না পারলে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র ডান হাত উঠিয়ে ইশারা করা ও بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ বলা।

৬. হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা।

৭. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামানি ব্যতীত কাবার অন্য কোনো অংশ তাওয়াফের সময় স্পর্শ না করা। হাঁ, তাওয়াফ শেষ হলে বা অন্য কোনো সময় মুলতাযামের জায়গায় হাত-বাহু-গণ্ডদেশ ও বক্ষ রাখা যেতে পারে।

৮. মাকামে ইব্রাহীম স্পর্শ না করা।

৯. পুরুষদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পবিত্র কাবার কাছ দিয়ে তাওয়াফ করা।

১০. নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে একপাশ হয়ে তাওয়াফ করা।

১১. খুশুখুজুর সাথে তাওয়াফ করা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা।

১২. রুকনে য়ামানি ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে

---

[১] -বোখারি : ৪৪৮

[২] - والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل (শাওকানী: নাইলুল আওতার, পৃ: ৯৬০)

[৩] - শাওকানী : নাইলুল আওতার, পৃ: ৯৬০

رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

-এই দোয়া পড়া।

১৩. প্রত্যেক তাওয়াফে ভিন্ন ভিন্ন দোয়া আছে এরূপ বিশ্বাস না করা।

১৪. সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করা।

১৫. তাওয়াফ করার সময় নারীদের স্পর্শ থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা।

১৬. তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করা। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় করা।

১৭. সালাত শেষে যমযমের পানি পান করা ও মাথায় ঢালা।

উমরার তাওয়াফ শুরু

গায়ের চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নীচে রেখে ডান কাঁধ খালি রাখুন। চাদরের উভয় মাথা বাঁ কাঁধের ওপর রেখে দিন, অর্থাৎ ইযতিবা করুন। মনে-মনে তাওয়াফের নিয়ত করুন। হাজরে আসওয়াদ সোজা মুখোমুখী দাঁড়ান। ভিড় না থাকলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে তাওয়াফ আরম্ভ করুন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পদ্ধতি হল এই–হাজরে আসওয়াদের ওপর দু'হাত রাখুন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে আলতোভাবে চুম্বন করুন। আল্লাহর জন্য হাজরে আসওয়াদের উপর সিজদাও করুন।[১] চুম্বন করা দুষ্কর হলে, ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করুন এবং হাতের যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সে অংশ চুম্বন করুন। বর্তমানে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও স্পর্শ উভয়টাই অত্যন্ত কঠিন ও অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। বোখারির বিবরণ মতে, সে হিসেবে দূরে দাঁড়িয়ে ডান হাত উঁচু করে, **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'** বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে এক হাত দ্বারা ইশারা করুন। যেহেতু হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি তাই হাতে চুম্বনও করতে হবে না।[২] পূর্বে হাজরে আসওয়াদ বরাবর একটি খয়েরি রেখা ছিল বর্তমানে তা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই হাজরে আসওয়াদ সোজা মসজিদুল হারামের কার্নিশে থাকা সবুজ বাতি দেখে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসেছেন কি-না তা নির্ণয় করুন।

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, 'হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামানি মাসেহ (স্পর্শ) গুনাহ-অন্যায় সমূলে বিলুপ্ত করে দেয়।[৩] তাই হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শের বিষয়টি কখনো অগুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন না। তবে অন্যদের যেন কষ্ট না হয় সে বিষয়টি নজরে রাখতে হবে।

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, স্পর্শ অথবা ইশারা করার পর কাবা শরীফ হাতের বায়ে রেখে তাওয়াফ শুরু করুন। পুরুষদের ক্ষেত্রে কাবা শরীফের কাছ দিয়ে তাওয়াফ করতে পারলে ভাল। রামলবিশিষ্ট তাওয়াফ হলে প্রথম তিন চক্করে রামল করুন। ছোট কদমে কাঁধ হেলিয়ে বীর-বিক্রমে চলুন। অবশিষ্ট চার চক্করে চলার গতি স্বাভাবিক রাখুন। প্রত্যেক তাওয়াফে ভিন্ন ভিন্ন দোয়া পড়তে হবে এ ব্যাপারে হাদিসে কিছু পাওয়া যায় না। যখন যে ধরনের আবেগ আসে সে ধরনের দোয়া করুন। আল্লাহর প্রশংসা করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওপর দরুদ পড়ুন। যে ভাষা আপনি ভাল করে বোঝেন ও আপনার মনের আকুতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দোয়া করুন। রুকনে য়ামানি অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের আগের কোণের কাছে এলে তা স্পর্শ করুন। রুকনে য়ামানি স্পর্শ করার পর হাত চুম্বন করতে হয় না। সরাসরি রুকনে য়ামানিকে চুম্বন করাও শরিয়তসম্মত নয়। রুকনে য়ামানি থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

–'হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, ও পরকালেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন' পড়তেন।[৪] সে হিসেবে আমাদের জন্য এ জায়গায় উক্ত দোয়া পড়া সুন্নত। হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলে ডান হাত উঁচু করে আবার তাকবির বলুন। এভাবে সাত চক্কর শেষ করুন। শেষ চক্করেও হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলে তাকবির দিন। অর্থাৎ সাত চক্করে তাকবির হবে ৮ টি।

তাওয়াফ শেষ হলে, ডান কাঁধ ঢেকে ফেলুন, যা ইতোপূর্বে খোলা রেখেছিলেন। এবার মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন,

' وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

---

[১] - দেখুন : মুসনাদ আদ-তায়ালিসি : ১/২১৫-২১৬

[২] - বোখারি শরীফে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে.' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উটের ওপর আরোহণ করে তরয়াফ করেন। তিনি যখনই রুকনের বরাবর এসেছেন হাতে-থাকা কোনো কিছু দিয়ে উহার দিকে ইশারা করেছেন, ও আল্লাহ আকবার বলেছেন (বোখারি : হাদিস নং ১৬০৭)

[৩] -مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا (ইবনু খুযায়মাহ : ২৭২৯; হাদিসটি সহিহ সনদে উল্লেখ হয়েছে)

[8] - عن عبد الله بن السائب قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بين الركن والحجر : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي وعبد الزراق وابن خزيمة والحاكم وصححه الحاكم في شرط مسلم ووافقه الذهبي

–মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের স্থল হিসেবে সাব্যস্ত করো।[১] জায়গা না পেলে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে সালাত আদায় করুন। [২] মাকরুহ সময় হলে এ দু'রাকাত সালাত পরে আদায় করে নিন। সালাতের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করার বিধান নেই। এ সালাতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা 'কাফিরুন' – قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ – ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস– قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ পড়া সুন্নত। [৩] সালাত শেষ করে যমযমের পানি পান করুন, ও মাথায় ঢালুন।

যমযমের পানি পানের ফজিলত

যমযমের পানি পবিত্রতম পানি। পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি।[৪] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যমযমের পানি পান করেছেন ও বলেছেন, এটা মুবারক পানি, এটা ক্ষুধা নিবারক খাদ্য, ও রোগের শেফা।[৫]

যমযমের পানি পান করার আদব

কেবলামুখী হয়ে তিন নিশ্বাসে যমযমের পানি পান করতে হয়। পান করার শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয়। পেট ভরে পান করতে হয়।[৬] পান করা শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়।[৭] ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) যমযমের পানি পানের পূর্বে এই দোয়া পড়তেন,

' اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا وَاسِعًا ، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

– হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, বিস্তৃত সম্পদ, ও সকল রোগ থেকে শেফা কামনা করছি'।[৮] পানি পান করার পর মাথায়ও কিছু পানি ঢালুন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করতেন।[৯] যমযমের পানি পান করে সাঈ করার জন্য প্রস্তুতি নিন।

---

[১] - সূরা আল বাকারা : ১২৫

[২] - এই সালাতটি হানাফি মাযহাবে ওয়াজিব, অন্যান্য মাযহাবে সুন্নত।

[৩] - তিরমিযী : হাদিস নং ৮৬৯

[৪] – خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم (তাবরানী, ইবনে হিব্বান)

[৫] - ان رسول الله شرب من ماء زمزم ، وأنه قال : إنها مباركة . إنها طعام طعم وشفاء سقم (বোখারি ও মুসলিম)

[৬] - রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমাদের মাঝে ও মোনাফেকদের মাঝে পার্থক্য এই মোনাফেকরা পেটভরে ভরে পানি পান করে না। (ইবনে মাযাহ, দারা কুতনী)

[৭] - দলিল, ইবনে আব্বাস (র) এর একটি বর্ণনা। তিনি বলেন,' إذا شربت منها فاستقبل القبلة ، و اذكر الله ، وتنفس ثلاثا ، وتضلع منها ، فإذا فرغت فاحمد الله . – যখন তুমি যমযমের পানি পান করবে, কেবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, ও তিন বার নিশ্বাস নিবে। তুমি তা পেট পুড়ে খাবে ও শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করবে।

[৮] - দারা কুতনী

[৯] কিতাবুল মুগনি ফিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ : ৩১০

সাঈ যাতে যথার্থভাবে আদায় হয় সেজন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখুন

সাঈ করার নিয়ত বা প্রতিজ্ঞা করা।

- হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন–স্পর্শ) করে সাঈর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।
- ওজু অবস্থায় সাঈ করা।
- তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে সাঈ করা।
- সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে, হাত উঠিয়ে, দীর্ঘক্ষণ দোয়া করা।
- পুরুষদের জন্য সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে একটু দৌড়ে অতিক্রম করা।
- সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে পড়বে—

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.

হে আল্লাহ ! ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী ও মহা দয়াবান।[১]

- সাত চক্কর পূর্ণ করা।
- সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা।
- সাফা মারওয়া বরাবর মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করা। মাসআ অর্থাৎ সাঈ করার সুনির্ধারিত স্থানের বাইরে দিয়ে চক্কর লাগালে সাঈ হবে না।
- দুই চক্করের মাঝে বেশি বিলম্ব না করা।

উল্লিখিত পয়েন্টগুলো অনুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন। তাহলে আপনার সাঈ শত ভাগ শুদ্ধ হবে। এর কোনোটায় ত্রুটি থেকে গেলে বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নিন।

সাঈ শুরু

সাঈ করতে যাচ্ছেন এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করুন। সাঈর পূর্বে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ করুন। চুম্বন-স্পর্শ সম্ভব না হলে, এ ক্ষেত্রে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করার কোনো বিধান নেই।[২] এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে আগান। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে, রাসূলুল্লাহ (স) এর অনুসরণে বলুন—

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِّ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

উচ্চারণ: ইন্নাস্‌সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়িরিল্লাহ। আব্দায়ু বিমা বাদায়াল্লাহু বিহি

অর্থ: নিশ্চয়ই সাফা মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। আমি শুরু করছি আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন।[৩]

এরপর সাফা পাহাড়ে ওঠে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণা দিয়ে বলবে—

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুলমুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আব্দাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ্।

অর্থ: আল্লাহ সুমহান, আল্লাহ সুমহান, আল্লাহ সুমহান ![৪] আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, এবং আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন, ও সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি

---

[১] তাবরানি : ৮৭০

[২] - কেননা রাসূলুল্লাহ (স) এর হজের বর্ণনায় সাঈর পূর্বে (استلام) ইস্তিলাম এর কথা আছে। আর ইস্তিলাম শব্দের অর্থ চুম্বন বা স্পর্শ। ইশারা করাকে ইস্তিলাম বলা হয়না। (দেখুন : লিসানুল আরব: খন্ড ১২, পৃ:২৯৭)

[৩] ইমাম মুসলিম কর্তৃক জাবের রা. হতে বর্ণিত হাদিস : কিতাবুল মুগনি : ৩১০

[৪] নাসায়ি : ২/ ৬২৪

তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, ও তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন।[১] এবং উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করবে।[২] উপরোক্ত দোয়া এবং ইহ–পরকালের জন্য কল্যাণকর অন্যান্য দোয়া সামর্থ্য অনুযায়ী তিন বার পড়বে। পদ্ধতি এমন হবে যে, উক্ত দোয়াটি একবার পাঠ করে তার সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যান্য দোয়া পড়বে। অত:পর পুনরায় উক্ত দোয়াটি পাঠ করবে এবং তার সাথে অন্যান্য দোয়া পাঠ করবে। এভাবে তিন বার করবে।[৩]

দোয়া শেষ হলে মারওয়ার দিকে রওয়ানা হোন। যেসব দোয়া আপনার মনে আসে পড়ুন। সাফা থেকে নেমে কিছু দূর এগোলেই ওপরে ও ডানে-বামে সবুজ বাতি জ্বালানো দেখবেন। এই জায়গাটুকু, পুরুষ হাজিগণ, দৌড়ানোর মত করে দ্রুত গতিতে হেঁটে চলুন। পরবর্তী সবুজ বাতির আলামত এলে চলার গতি স্বাভাবিক করুন। তবে নারীদের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় চলার গতি থাকবে স্বাভাবিক। সবুজ দুই আলামতের মাঝে চলার সময় নীচের দোয়াটি পড়ুন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.

উচ্চারণ: রাব্বিগ্‌ফির্ ওয়ার্‌হাম্, ইন্নাকা আন্তাল্ আয়া'য্‌যুল আকরাম্

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি সমধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।

মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছার পূর্বে, সাফায় পৌঁছার পূর্বে যে আয়াতটি পড়েছিলেন, তা পড়তে হবে না। মারওয়ায় উঠে সাফার মতো পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে একই কায়দায় হাত উঠিয়ে মোনাজাত করুন। মারওয়া থেকে সাফায় আসার পথে সবুজ বাতির এখান থেকে আবার দ্রুত গতিতে চলুন। দ্বিতীয় সবুজ আলামতের এখানে এলে চলার গতি স্বাভাবিক করুন। সাফায় এসে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আবার মোনাজাত ধরুন। সাফা মারওয়া উভয়টা দোয়া কবুলের জায়গা। কাজেই তাড়াতাড়ি সাঈ সেরে নিয়ে বাসায় চলে যাওয়ার চিন্তা করবেন না। ধীরে সুস্থে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেখানে যা করেছেন সেখানে সেটা সেভাবেই করার চেষ্টা করুন। কতটুকু করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে, এই চিন্তা মাথায় আনবেন না। বরং এটা টারগেট বানাবেন যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোথায় কোন কাজ কীভাবে ও কত সময় করেছেন, আমিও ঠিক সেভাবেই করব।

একই নিয়মে সাঈর বাকি চক্করগুলোও আদায় করুন। সাঈ করার সময় সালাত দাঁড়িয়ে গেলে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করুন। সাঈ করার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লে বসে আরাম করে নিন। এতে সাঈর কোনো ক্ষতি হবে না।

আপনার শেষ সাঈ—অর্থাৎ সপ্তম সাঈ—মারওয়াতে গিয়ে শেষ হবে। শেষ হওয়ার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করতে যাবেন। মারওয়ার পাশেই চুল কাটার সেলুন রয়েছে। সেখানে গিয়ে মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করে নিন। যদি হজের জন্য মাথা মুণ্ডানোর সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ জিলহজ এর পূর্বে আপনার মাথার চুল গজাবে না এরূপ আশঙ্কা হয় তবে উমরার পর চুল ছোট করা উত্তম। বিদায় হজের সময় তামাত্তুকারী সাহাবাগণ কসর - চুল ছোট-করেছিলেন।[৪] কেননা তাঁরা হজের পাঁচ দিন পূর্বে উমরা আদায় করেছিলেন। তবে অন্যসব ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম।

মনে করিয়ে দেয়া ভাল যে, পবিত্র কুরআনে 'হলক' এবং'কসর' এর কথা এসেছে। মাথার চুল গোড়া থেকে কেটে ফেলাকে হলক বলে আর ছোট করাকে বলে কসর। কারও কারও মতে এক আঙুল চুল ছেঁটে ফেলাকে কসর বলে। তাই মাথায় যদি একেবারেই চুল না থাকে তাহলে সত্যিকার অর্থে হলক ও কসর কোনোটাই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মুণ্ডিত মাথায় নতুন করে ক্ষুর চালালে এটাকে কেউ মাথা মুণ্ডন বলে না, বরং এটা হবে تمرير الموسى (ক্ষুর সঞ্চালন) যা কেবল টাক-মাথা ওয়ালাদের জন্য প্রযোজ্য।

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার পর গোসল করে স্বাভাবিক সেলাই করা কাপড় পরে নেবেন। ৮ জিলহজ পর্যন্ত হালাল অবস্থায় থাকবেন। এহরাম বাঁধতে হবে না। এখন আপনার কাজ হবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করা, ও হজের ব্যাপারে পড়াশোনা করে খুব সুন্দরভাবে বড় হজের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। সাধ্য-মত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা।

উমরা বিষয়ে আরো কিছু তথ্য

পবিত্র কুরআনে, হজ ও উমরা উভয়টির কথা এসেছে। এরশাদ হয়েছে, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ। তোমরা হজ ও উমরা আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ করো'[৫]

এ'তেমার (اعتمار) শব্দ থেকে উমরা (عمرة) উৎকলিত। এর শাব্দিক অর্থ,যিয়ারত করা। পারিভাষিক অর্থে, পবিত্র কাবার যিয়ারত তথা তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ ও মাথা মুণ্ডন (হলক) ও চুল ছোট করা (কসর) কে উমরা বলা হয়।

উমরার ফজিলত

---

[১] - আলবানী : সহিহুন্নাসায়ী, ২/২২৪ ও মুসলিম : ২/২২২

[২] আবু দাউদ : ১/৩৫১

[৩] মুসলিম : হাদিসে জাবের : ২১৩৭

[৪] - فحل الناس كلهم وقصروا (হাদিসে জাবের: মুসলিম)

হাদিসে এসেছে, 'রমজান মাসে উমরা করা এক হজের সমান'[১] 'এক উমরা থেকে অন্য উমরা, এ-দুয়ের মাঝে কৃত পাপের, কাফফারা।'[২] 'যে ব্যক্তি এই ঘরে এলো, অতঃপর যৌনতা ও শরিয়ত-বিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত রইল, সে মাতৃ-গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট 'হওয়ার দিনের মত হয়ে ফিরে গেল।' ইমাম ইবনে হাজার আসকালানির মতানুসারে এখানে হজকারী ও উমরাকারী উভয় ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে।[৩]

হজের সফরে একাধিক উমরা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম এক সফরে একাধিক উমরা করেননি। শুধু তাই নয় বরং তামাত্তু হজকারীদেরকে উমরা আদায়ের পর হালাল অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে।[৪] তাই উত্তম হল এক সফরে একাধিক উমরা না করা। একাধিক উমরা থেকে বরং বেশি বেশি তাওয়াফ করাই উত্তম। তবে যদি কেউ উমরা করতেই চায় তাহলে হজের পরে করা যেতে পারে, যেমনটি করেছিলেন আয়েশা (رضي الله عنها) ; তবে, রাসূল তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন—এমন কোন প্রমাণ নেই। বরং, নিরুৎসাহিত করেছেন এমন বর্ণনা হাদিসে পাওয়া যায়।[৫]

অন্যান্য সময়ে একাধিক বার উমরা করা প্রসঙ্গে

এক বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জীবনে মোট চার বার উমরা করেছেন। প্রথমবার: হুদায়বিয়ার উমরা, যা পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সম্পন্ন করতে পারেননি। বরং সেখানেই মাথা মুণ্ডনের মাধ্যমে হালাল হয়ে যান। দ্বিতীয় বার: উমরাতুল কাজা। তৃতীয় বার : জিয়িররানা থেকে। চতুর্থবার: বিদায় হজের সাথে। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমরার উদ্দেশ্যে হেরেমের এরিয়ার বাইরে বের হয়ে উমরা করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।[৬]

সাহাবায়ে কেরামের উমরা আদায়ের পদ্ধতি থেকে অবশ্য হজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বছরে একাধিকবার উমরা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। মক্কায় ইবনে যুবায়ের (رضي الله عنه) এর শাসনামলে ইবনে উমর বছরে দুটি করে উমরা করেছেন। আয়েশা (رضي الله عنها) বছরে তিনটি পর্যন্ত উমরাও করেছেন।[৭] এক হাদিসে এসেছে, 'তোমরা বার বার হজ ও উমরা আদায় করো। কেননা এ দুটি দারিদ্র্য ও গুনাহ বিমোচন করে দেয়।'[৮] সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে দেখা যেত, এক উমরা আদায়ের পর তাদের মাথার চুল কাল হয়ে যাওয়ার আবার উমরা করতেন, তার আগে করতেন না।[৯]

উমরা করা সুন্নত না ওয়াজিব

উমরা শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। তবে হজের মত উমরা আদায় আবশ্যিক কি-না সে ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) এর নিকট উমরা করা ওয়াজিব। প্রমাণ: পবিত্র কুরআনের বাণী "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" –তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ কর।'[১০] এই অভিমতের পক্ষে বেশ কিছু হাদিসও রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি হল নিম্নরূপ—

১. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে এসে বললেন আমার পিতা খুব বৃদ্ধ। তিনি হজ-উমরা করতে অপারগ, এমনকী সফরও করতে পারেন না। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ ও উমরা পালন করো।'[১১]

২. কোনো কোনো বর্ণনায় হাদিসে জিব্রিলের একাংশে এসেছে (وأن تحج وتعتمر –তুমি হজ করবে ও উমরা করবে)[১২]

৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, নারীর ওপর কি জিহাদ ফরজ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাদের ওপর জিহাদ আছে যে জিহাদে কিতাল (যুদ্ধ) নেই। আর তা হল হজ ও উমরা।[১৩]

৪. হাদিসে এসেছে, 'হজ ও উমরা দুটি ফরজ কর্ম। এতে কিছু যায় আসে না যে তুমি কোনটি দিয়ে শুরু করলে।'[১]

---

[১] - عمرة في رمضان تعدل حجة (তিরমিযী: হাদিস নং ৮৬১ ; ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ২৯৮২)

[২] - عمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (বোখারি : হাদিস নং ১৬৫০)

[৩] - ফাতহুল বারী : ৩/৩৮২

[৪] - وأقيموا حلالا (মুসলিম)

[৫] বিস্তারিত দেখুন : যাদুল মাআদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৫

[৬] বিস্তারিত দেখুন : যাদুল মাআদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৫

[৭] - সাইয়িদ সাবিক : ফেকহুস্‌সুন্নাহ , খন্ড : ৭ , পৃ: ৭৪৯

[৮] - আলবানী : সহিহুন্নাসায়ী : হাদিস নং ৫৫৮

[৯] বিস্তারিত দেখুন : যাদুল মাআদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০-৯৫

[১০] - সূরা আল বাকারা : ১৯২

[১১] - أتى رجل فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ، فقال : حج عن أبيك واعتمر (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৮১০; তিরমিযী : হাদিস নং ৯৩০)

[১২] -ইবনে হিব্বান : হাদিস নং ১৭৩ ; দারা কুতনী : ২/২৮২)

[১৩] - আহমদ : ২/১৬৫ ; ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ২৯০১

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতানুসারে উমরা করা সুন্নত। প্রমাণ, জাবের (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদিসঃ উমরা করা ওয়াজিব কি-না রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। উত্তরে তিনি বলেছেন, না; তবে যদি উমরা করো তা হবে উত্তম।[২]

উভয়পক্ষের দলিল প্রমাণ পর্যালোচনা করলে যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের কথাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে মনে হয়।

উমরা কখন করা যায়

আরাফা দিবস, ও ১০, ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ এই পাঁচ দিন উমরা করা উচিত নয়। তবে বছরের বাকি দিনগুলোতে যে কোনো সময় উমরা আদায়ে কোনো সমস্যা নেই।

উমরার মীকাত

হজের মীকাতের বর্ণনা আগেই গিয়েছে। উমরাকারী যদি এই মীকাতের বাইরে থেকে আসে তাহলে মীকাত থেকে এহরাম বেঁধে আসতে হবে।[৩] উমরাকারী যদি হেরেমের অভ্যন্তরে থাকে তাহলে হেরেম এর এরিয়া থেকে বাইরে যেতে হবে। হিল্ল থেকে এহরাম বাঁধতে হবে। সবচেয়ে নিকটবর্তী হিল্ল হল তানয়ীম, যেখানে বর্তমানে মসজিদে আয়েশা রয়েছে।

---

[১] - إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت (দারা কুতনী : হাদিস নং ২১৭)

[২] - أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة ، أواجبة هي ، فقال: لا ، و أن تعتمروا أفضل (আহমদ, তিরমিযি)

[৩] - দেখুন মুসলিম : হাদিস নং ১১৮১

তাওয়াফ ও সাঈ

বিস্তারিত আলোচনা

তাওয়াফের সংজ্ঞা

কোনো কিছুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করাকে শাব্দিক অর্থে তাওয়াফ বলে। হজের ক্ষেত্রে কাবা শরীফের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে। পবিত্র কাবা ব্যতীত অন্য কোনো জায়গায় কোনো জিনিসকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা হারাম।

তাওয়াফের ফজিলত

হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল, ও দু'রাকাত সালাত আদায় করল, তার এ কাজ একটি গোলাম আযাদের সমতুল্য হল।[১] হাদিসে আরো এসেছে, 'তুমি যখন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলে, পাপ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলে যেমন নাকি আজই তোমার মাতা তোমাকে জন্ম দিলেন।[২]

তাওয়াফের প্রকারভেদ

১. তাওয়াফে কুদুম

এফরাদ হজকারী মক্কায় এসে প্রথম যে তাওয়াফ আদায় করে তাকে তাওয়াফে কুদুম বলে। কেরান হজকারী ও তামাত্তু হজকারী উমরার উদ্দেশ্যে যে তাওয়াফ করে থাকেন তা তাওয়াফে কুদুমেরও স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

তবে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী কেরান হজকারীকে উমরার তাওয়াফের পর ভিন্নভাবে তাওয়াফে কুদুম আদায় করতে হয়। হানাফি মাজহাবে তামাত্তু ও শুধু উমরা পালনকারীর জন্য কোনো তাওয়াফে কুদুম নেই।

কুদুম শব্দের অর্থ আগমণ। সে হিসেবে তাওয়াফে কুদুম কেবল বহিরাগত হাজিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মক্কায় বসবাসকারীরা যেহেতু অন্য কোথাও থেকে আগমন করে না, তাই তাদের জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নত নয়।

২. তাওয়াফে এফাদা বা যিয়ারত

সকল হজকারীকেই এ তাওয়াফটি আদায় করতে হয়। এটা হল হজের ফরজ তাওয়াফ যা বাদ পড়লে হজ সম্পন্ন হবে না। তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের আওয়াল ওয়াক্ত শুরু হয় ১০ তারিখ সুবহে সাদেক উদয়ের পর থেকে। জমহুর ফুকাহার নিকট ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে সম্পন্ন করা ভাল। এর পরে করলেও কোনো সমস্যা নেই। সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) এর নিকট তাওয়াফে এফেদা আদায়ের সময়সীমা উন্মুক্ত। ইমাম আবু হানিফা (র) এর নিকট তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের ওয়াজিব সময় হল ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এ সময়ের পরে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে ফরজ আদায় করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে তবে ওয়াজিব তরক হওয়ার কারণে দম দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জন্য হালাল হয় না।

৩. তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ি তাওয়াফ

বায়তুল্লাহ শরীফ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে বিদা বলে। এ তাওয়াফ কেবল বহিরাগতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মক্কায় বসবাসকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেহেতু মক্কায় বসবাসকারী হাজিদের জন্য প্রযোজ্য নয়, তাই এ তাওয়াফ হজের অংশ কি–না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেননা হজের অংশ হলে মক্কাবাসী এ থেকে অব্যাহতি পেত না। মুসলিম শরীফের একটি হাদিস থেকেও বুঝা যায় যে বিদায়ি তাওয়াফ হজের অংশ নয়। হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا মুহাজির ব্যক্তি হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবে।[৩] 'হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর' এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে বিদায়ি তাওয়াফের পূর্বেই হজের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে বহিরাগত হাজিদের জন্য বিদায়ি তাওয়াফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হানাফি মাজহাবে ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ

---

[১] - من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة (ইবনু মাযাহ : ২৯৫৬; আলবানী এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন: সহীহু ইবনি মাযাহ: ২৩৯৩)

[২] - فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك (মুসান্নাফু আব্দিররাজ্জাক : ৮৮৩০)

[৩] - মুসলিম : হাদিস নং ২৪০৯

(ﷺ) তাগিদ দিয়ে বলেছেন, বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ না দিয়ে তোমাদের কেউ যেন না যায়।[১] তবে এ তাওয়াফ যেহেতু হজের অংশ নয় তাই ঋতুস্রাবগ্রস্থ মহিলা বিদায়ি তাওয়াফ না করে মক্কা থেকে প্রস্থান করতে পারে।

৪. তাওয়াফে উমরা : উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে এ তাওয়াফ ফরজ ও রুকন। এ তাওয়াফে রামল ও ইযতিবা উভয়টাই রয়েছে।

৫. তাওয়াফে নযর : ইহা মান্নত হজকারীদের ওপর ওয়াজিব।

৬. তাওয়াফে তাহিয়্যা : ইহা মসজিদুল হারামে প্রবেশকারীদের জন্য মুস্তাহাব। তবে যদি কেউ অন্য কোনো তাওয়াফ করে থাকে তাহলে সেটিই এ তাওয়াফের স্থলাভিষিক্ত হবে।

৭. নফল তাওয়াফ : যখন ইচ্ছা তখনই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা যায়।

তাওয়াফ বিষয়ক কিছু জরুরি মাসায়েল

তাওয়াফের পূর্বে পবিত্রতা জরুরি। কেননা আপনি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে যাচ্ছেন যা পৃথিবীর বুকে পবিত্রতম জায়গা। বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে ওজু করেছেন, তারপর তাওয়াফ শুরু করেছেন। [২] আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে হজ করেছেন আমাদেরকেও তিনি সেভাবেই হজ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, ' خذوا عني مناسككم –আমার কাছ থেকে তোমাদের হজকর্মসমূহ জেনে নাও।'[৩] ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক হাদিসে তাওয়াফকে সালাতের তুল্য বলা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ তা'আলা এতে কথা বলা বৈধ করে দিয়েছেন, তবে যে কথা বলতে চায় সে যেন উত্তম কথা বলে।[৪] এহরাম অবস্থায় আয়েশা (ﷺ) এর ঋতুস্রাব শুরু হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে তাওয়াফ করতে নিষেধ করে দেন।[৫] এ হাদিসও তাওয়াফের সময় পবিত্রতার গুরুত্বের প্রতিই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সে কারণেই ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ ওজু অবস্থায় তাওয়াফ করাকে ওয়াজিব বলেছেন।[৬]

তাওয়াফের সময় সতর ঢাকাও জরুরি। কেননা জাহেলি-যুগে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করার প্রথাকে বন্ধ করার জন্য পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

– হে বনী আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সৌন্দর্য অবলম্বন করো।[৭] ইবনে আব্বাস (ﷺ) সৌন্দর্য অর্থ পোশাক বলেছেন। এক হাদিস অনুযায়ী তাওয়াফও একপ্রকার সালাত তা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। তাছাড়া ৯ হিজরীতে, হজের সময় পবিত্র কাবা তাওয়াফের সময় যেন কেউ উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ না করে সে মর্মে ফরমান জারি করা হয়।[৮]

তাওয়াফের শুরুতে নিয়ত করা বাঞ্ছনীয়। তবে সুনির্ধারিতভাবে নিয়ত করতে হবে না। বরং মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা করলেই চলবে যে আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে যাচ্ছি। অনেক বই-পুস্তকে তাওয়াফের যে নিয়ত লেখা আছে–আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদু তাওয়াফা বায়তিকাল হারাম ফা য়াস্সিরহু লি ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নি—হাদিসে এর কোনো ভিত্তি নেই।

সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করা উচিত। চার চক্করে তাওয়াফ শেষ করা কখনো উচিত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরাম, তাবেইন, তাবে-তাবেইনদের মধ্যে কেউ চার চক্করে তাওয়াফ শেষ করেছেন বলে হাদিস ও ইতিহাসে নেই।

তাওয়াফ হজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে শেষ করতে হবে। কেউ যদি হজরে আসওয়াদের বরাবর আসার একটু পূর্বেও তাওয়াফ ছেড়ে দেয় তাহলে তার তাওয়াফ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে না।

তাওয়াফ করার সময় রামল ও ইযতিবা

কোন কোন তাওয়াফে রামল ও ইযতিবা আছে তা নিয়ে ফেকাহবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। উমরার তাওয়াফ ও কুদুমের তাওয়াফেই কেবল ইযতিবা আছে, এটাই হল বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ দু'ধরনের তাওয়াফে রমল

---

[১] - لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (মুসলিম)

[২] – أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ، أن توضأ ثم طاف بالبيت
(ফাতহুল বারী : ৩/৩০৩ , হাদিস নং ১৬৪১)

[৩] - শারহুননববী আলা মুসলিম: খন্ড ৮ , ২২০

[৪] - عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير بالبيت (মুহাদ্দিস নাসীরুদ্দিন আল-বানী এ হাদিসটি সহিহ বলেছেন: এরওয়া : ২১)

[৫] - فاقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي – অন্য হাজীরা যা করে তুমিও তাই করবে, তবে পবিত্র হয়ার পর গোসলের পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। (মুসলিম)

[৬] - ইমাম মুহাম্মদ আশ্‌শানকীতি: খালিসূল জুমান,পৃ: ১৮২

[৭] সূরা আরাফ : ৩১

[৮] - ইবনে কাছীর : খন্ড১, পৃ: ১৫৭

ও ইযতিবা করেছেন।[১] হানাফি মাজহাব অনুসারে যে তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার সাঈ আছে সে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল ও পুরা তাওয়াফে ইযতিবা আছে।

নারীর তাওয়াফ

নারী অবশ্যই তাওয়াফ করবে। তবে পুরুষদের সাথে মিশ্রিত হয়ে নয়। যখন ভিড় কম থাকে তখন নারীদের তাওয়াফ করা বাঞ্ছনীয়। অথবা, একটু সময় বেশি লাগলেও দূর দিয়ে নারীরা তাওয়াফ করবে। পুরুষের ভিড়ে নারীরা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে যাবে না। আয়েশা (রাঃ) এর তাওয়াফের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে—

كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال ، لا تخالطهم ، فقالت امرأة: انطلقى نستلم يا أم المؤمنين . قالت: انطلقي -- عنك ، وأبت.

–আয়েশা (রাঃ) পুরুষদের একপাশ হয়ে একাকী তাওয়াফ করতেন। পুরুষদের সাথে মিশতেন না। এক মহিলা বললেন: চলুন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ করি। তিনি বললেন, তুমি যাও—আমাকে ছাড়। তিনি যেতে অস্বীকার করলেন।[২]

ঋতুস্রাব অবস্থায় নারীরা তাওয়াফ করবে না। প্রয়োজন হলে হজের সময়ে ঋতুস্রাব ঠেকানোর জন্য ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে, ব্যবহার করার বৈধতা রয়েছে। তাওয়াফের সময় নারীর জন্য কোনো রামল বা ইযতিবা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নারীকে রামল ইযতিবা করতে বলেননি।

হজের ফরজ তাওয়াফের সময় যদি কারও ঋতুস্রাব চলে আসে এবং ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করা কোনো ক্রমেই সম্ভব না হয়, পরবর্তীতে এসে ফরজ তাওয়াফ আদায় করারও কোনো সুযোগ না থাকে, এমন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞ ওলামাগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে ন্যাপকিন দিয়ে ভালো করে বেঁধে তাওয়াফ আদায় করে নিতে পারে।

সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ

সাত চক্কর কীভাবে হিসাব করবেন?

সাফা মারওয়ার মাঝে যাওয়া-আসা করাকে সাঈ বলে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর হয়, আবার মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে এলে আরেক চক্কর। অনেকেই ভুল করে, সাফা থেকে মারওয়া আবার মারওয়া থেকে সাফায় পর্যন্ত, এক চক্কর হিসাব করে থাকে। অর্থাৎ সাফা মারওয়ার মাঝে ১৪ বার যাতায়াত করে ৭ চক্কর হিসাব করে থাকে, এটা মারাত্মক ভুল।

সাঈ করার গুরুত্ব ও হুকুম

ফরজ তাওয়াফ – যেমন তাওয়াফে উমরা ও তাওয়াফে ইফাযা– এর পর সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করাও আবশ্যিক। জমহুর ফুকাহা সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈকে রুকন হিসেবে গণ্য করেছেন।[৩] হাদিসে এসেছে, 'আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার জীবনকে সাক্ষী রেখে বলছি, ওই ব্যক্তির হজ আল্লাহর কাছে পূর্ণতা পাবে না যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করল না।[৪] অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'সাঈ করো, কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর সাঈ লিখে দিয়েছেন।[৫]

হানাফি মাজহাবে সাঈ করা ওয়াজিব, যদি কেউ ছেড়ে দেয় দম দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

সংক্ষেপে উমরা আদায়ের নিয়ম

পূর্বে উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী এহরাম বেঁধে উমরার নিয়ত করে لَبَّيْكَ عُمْرَةً **(লাব্বাইয়কা উমরাতান)** বলতে হবে। এরপর তালবিয়া পাঠ করে করে তাওয়াফ করতে যেতে হবে। তাওয়াফের নিয়ম অনুযায়ী সাত চক্করে পবিত্র কাবার তাওয়াফ করতে হবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হবে। ইযতিবাও করতে হবে। এরপর তাওয়াফের দু'রাকাত সালাত আদায় করে সাফা মারওয়ার সাঈ করতে হবে। সাঈ শেষ হলে মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করতে হবে। এখানেই উমরা শেষ। উমরার জন্য আর কিছু করতে হবে না।

জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের মর্যাদা

জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন গুরুত্বপূর্ণ সময়। পবিত্র কুরআনে জিলহজ মাসের প্রথম দশ রজনি নিয়ে কসম খেয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। এরশাদ হয়েছে

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ.

---

[১] - দেখুন : ফাতহুল বারী : ৩/২৬৯

[২] - বুখারি : ১৫১৩

[৩] - সূরা আল বাকারা : ১৫৮

[৪] – لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة (মুসলিম)

[৫] - اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي (আহমদ, দারা কুতনী)

"শপথ প্রত্যুষের ও দশ রজনির।" [১]

দশ রজনি বলতে জিলহজের প্রথম দশ রজনি বুঝায় এ ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস রা. ইবনে যুবায়ের ও মুজাহিদ রহ. সহ অনেকের। প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইবনে কাসির এ মতটিকেই বিশুদ্ধ বলেছেন।[২]

হাদিসে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, এমন কোনো দিবস নেই যার আমল **জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হবে**। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকেও কি অধিক প্রিয়? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হাঁ জিহাদ করা থেকেও অধিক প্রিয় তবে যদি এমন হয় যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হল এবং এর কোনো কিছুই ফেরত নিয়ে এল না। [৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত নবী কারিম (ﷺস.) বলেছেন: এ দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাকবির (আল্লাহু আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে আদায় **কর**।[৪]

এ দু হাদিসের অর্থ হল বছরে যতগুলো মর্যাদাপূর্ণ দিন আছে তার মধ্যে এ দশ দিনের প্রতিটি দিন হল সর্বোত্তম। যেমন এ দশ দিনের অন্তর্গত কোন জুমা'র দিন অন্য সময়ের জুমা'র দিন থেকে উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

(৩) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এ দিনসমূহে নেক আমল করার জন্য তার উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর এ উৎসাহ প্রদান এ সময়টার ফজিলত প্রমাণ করে।

(৪) নবী কারিম (ﷺ) এ দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলীল ও তাকবির পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন উপরে ইবনে আব্বাসের হাদিসে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

"যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।"[৫]

এ আয়াতে 'নির্দিষ্ট দিনসমূহ' বলতে কোন দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে ইমাম বুখারি (রহ:) বলেন, ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেছেন : 'নির্দিষ্ট দিনসমূহ' দ্বারা জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে।[৬]

(৫) জিলহজ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে আরাফা ও কুরবানির দিন। আর এ দুটো দিনেরই রয়েছে অনেক মর্যাদা। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "আরাফা দিবস থেকে অধিক অন্য কোনো দিন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন না। তিনি এ দিনে নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সম্মুখে গর্ব করে বলেন "তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দারা আমার কাছে কি চায়?"[৭]

আরাফা দিবস (জিলহজ মাসের নবম তারিখ) ক্ষমা ও মুক্তির দিন। এ দিবসে রোজা পালন দু'বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গণ্য হয়। হাদিসে এসেছে

আবু কাতাদাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "আরাফা দিবসের রোজা বিগত এক বছর ও আগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে বলে আল্লাহর প্রতি আমার আশা।"[৮]

তবে আরাফা দিবসের রোজা আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী হাজিদের জন্য প্রযোজ্য নয়।[৯] কুরবানি দিবসের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে : আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলার কাছে মহত্তম দিন হল কুরবানির দিন, তারপর পরবর্তী দিন।"[১০]

(৬) জিলহজ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলো মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ এ দিনগুলোয় নামাজ, রোজা, সদকা, হজ ও কুরবানির মত গুরুত্বপূর্ণ এবাদতগুলো একত্রিত হয় যার অন্য আরেকটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।[১১]

---

[১] - সূরা আল ফাজর : ১-২

[২] - দ্রঃ ইবনে কাসীর : সূরাতুল ফজরের ব্যাখ্যা।

[৩] - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : **ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر** ، فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ** (বোখারি ও তিরমিযি হাদিস)

[৪] - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد (আহমদ)

[৫] - সূরা হাজ্জ : ২৮

[৬] - ড়্বুখারি : باب فضل العمل في أيام التشريق

[৭] - عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول : ما أراد هؤلاء؟ (মুসলিম)

[৮] - عن أبي قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده . . . (رواه مسلم)

[৯] - মুসলিম : ১১২৩, আহমদ ২/৩০৪

[১০] - عن عبد الله بن قرط رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر (رواه أبو داود)

[১১] - দুরুসে আশরি যিল হজ্জি : ২২-২৩

জিলহজ মাসের প্রথম দশকে নেক আমলের ফজিলত

ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, এমন কোনো দিবস নেই যার আমল **জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হবে**। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকেও কি অধিক প্রিয়? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হাঁ জিহাদ করা থেকেও অধিক প্রিয় তবে যদি এমন হয় যে, ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হল এবং এর কোনো কিছুই ফেরত নিয়ে এল না।[১]

ইবনে রজব (রহ:) বলেছেন বুখারির এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, নেক আমলের মৌসুম হিসেবে জিলহজ মাসের প্রথম দশক হল সর্বোত্তম সময়, এ দিবসগুলোয় সম্পাদিত নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হাদিসের কোনো কোনো বর্ণনায় أحب (সর্বাধিক প্রিয়) শব্দ এসেছে আবার কোনো কোনো বর্ণনায় أفضل (সর্বোত্তম) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব এ সময়ে নেক আমল করা বছরের অন্য যে কোনো সময়ে নেক আমল করার থেকে বেশি মর্যাদা ও ফজিলতপূর্ণ। হজ ও কুরবানির মত গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ এ সময়েই সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে।

জিলহজের প্রথম দশকে যে সকল আমল করা যেতে পারে

১. ঐকান্তিকভাবে তাওবা করা

তাওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে যাওয়া। যে সব কথা ও কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অপছন্দ করেন তা বর্জন করে যেসব কথা ও কাজ তিনি পছন্দ করেন তার দিকে ফিরে যাওয়া। সাথে সাথে অতীতে এ ধরনের কাজে জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে ঐকান্তিকভাবে অনুতাপ ব্যক্ত করা। কাজগুলো পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা। আল্লাহ তা'আলার পছন্দের কাজগুলো করা ও অপছন্দের কাজগুলো ত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। কেবল কৃত পাপের জন্য তাওবা নয় বরং অতীতের সকল পাপের জন্যই তাওবা করা। তাওবার আবশ্যিকতা বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর,বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদী। সে দিন আল্লাহ লজ্জিত করবেন না নবীকে এবং তার মুমিন সঙ্গীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[২]

অতীতে কৃত সমগ্র পাপ-কর্ম থেকে তাওবা, সম্পূর্ণরূপে পাপ কর্ম পরিত্যাগের ব্যাপারে সততার পরিচয় দেয়ার পাশাপাশি আর কখনো পাপ-কর্মে জড়াবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা ও শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় বুকে ধারণ করে তার সন্তুষ্টি অর্জন কল্পে তাওবা করাকেই (التوبة النصوح) বা ঐকান্তিক তাওবা বলা হয়।[৩]

২. হজ ও উমরা আদায় করা

হজ ও উমরা পালনের ফজিলত বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে—ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া; কেননা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রধানতম ও অধিক প্রিয় মাধ্যম হল ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ যথাসময়ে নিয়ম মোতাবেক আদায় করা। এর পর নফল ইবাদতের পর্যায় যা একজন মানুষকে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র বানাতে সাহায্য করে। হাদিসে কুদসিতে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন অলির বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আর ফরজ ইবাদতের চাইতে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না, এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে এ পর্যন্ত যে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি, আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে। তার চোখ হয়ে যাব, যা দিয়ে সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার

---

[১] - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (**ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر**) فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (**ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء**) رواه البخاري والترمذي واللفظ له

[২] সূরা তাহরীম : ৮

[৩] - মাদারিজুসসালেকিন।

কাছে কোন কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দেব। আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেব। আমার কোনো কাজে দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা করি মুমিন ব্যক্তির প্রাণ নেয়ার ক্ষেত্রে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর তাকে কষ্ট দেয়া আমার কাছে অপছন্দ।”[১]

৩. বেশি করে নেক-আমল করা

নেক আমল সকল স্থানে ও সকল সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রিয়। তবে এই বরকতময় দিনগুলোতে নেক-আমলের মর্যাদা ও সওয়াব অনেক বেশি।

যারা এ দিনগুলোতে হজ আদায়ের সুযোগ পেলেন তারা যে ভাগ্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের উচিত হবে জিলহজ মাসের এই মুবারক দিনগুলোয়, যত বেশি পারা যায়, নেক আমল করে যাওয়া।

৪. জিকির-আযকারে নিমগ্ন সময় যাপন

এ দিনগুলোয় জিকির-আযকারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, হাদিসে এসেছে:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ﷺ) থেকে বর্ণিত নবী কারিম (ﷺ) বলেছেন, এ দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ) তাকবির (আল্লাহু আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে আদায় কর।[২]

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে—

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِّ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর ‘নির্দিষ্ট দিনসমূহে’ আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।”[৩]

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেছেন: এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিন সমূহ বলতে জিলহজের প্রথম দশ দিনকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ সময়ে আল্লাহর বান্দাগণ অধিক হারে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তার পবিত্রতা বর্ণনা করবে, ও তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, কুরবানির পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম ও তাকবির উচ্চারণ করবে।

৫. উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করা

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহত্ত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবির পাঠ করা সুন্নত। এ তাকবির প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে মসজিদ, বাড়ি-ঘর,রাস্তা-ঘাট,বাজারসহ সর্বত্র উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। তবে নারীদের তাকবির হবে নিম্ন স্বরে। তাকবিরের শব্দমালা নিম্নরূপ :

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.

তকবির বর্তমান হয়ে পড়েছে একটি পরিত্যাক্ত সুন্নত। আমাদের সকলের কর্তব্য এ সুন্নতের পুনর্জীবনের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারনা চালান। হাদিসে এসেছে—

من أحيا سنة من سنتي، قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل ما عمل بها، من غير أن .ينقص من أجورهم شيئاً.

যে ব্যক্তি আমার সুন্নত সমূহের মাঝে একটি সুন্নত পুনর্জীবিত করল, যা আমার পর বিলুপ্ত হয়েছে, তাকে সে পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে, যে পরিমাণ (সে সুন্নতের উপর) আমল করা হয়েছে। এতে (আমলকারীদের) সওয়াব হতে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।[৪]

জিলহজ মাসের সূচনা হতে আইয়ামে তাশরীক শেষ না হওয়া অবধি এ তাকবীর পাঠ করা সকলের জন্য ব্যাপকভাবে মোস্তাহাব। তবে, বিশেষভাবে আরাফা দিবসের ফজরের পর হতে মীনার দিনের শেষ পর্যন্ত—অর্থাৎ আসর—প্রত্যেক নামাজের পর উক্ত তাকবীর পাঠ করা বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ও আলী রা. হতে এ মতটি বর্ণিত। ইবনে তাইমিয়া রহ. একে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত বলেছেন। উল্লেখ : যদি কোন ব্যক্তি এহরাম বাধে, তবে সে তলবিয়ার সাথে মাঝে মাঝে তকবিরও পাঠ করবে। হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত।[৫]

---

[১] - عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى قال : من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري (বোখারি)

[২] - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد (رواه أحمد)

[৩] - সূরা আল হাজ্জ : ২৮

[৪] তিরমিযি : ৬৭৭

[৫] ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া : খণ্ড : ২৪, পৃ : ২২০

তাশরীক এর দিনসমূহে করণীয়

দশ জিলহজের পরবর্তী তিন দিন অর্থাৎ এগারো, বারো ও তেরো তারিখকে আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয়।

আইয়ামুত তাশরীকের ফজিলত

-এ দিনগুলো ইবাদত-বন্দেগি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির ও তার শুকরিয়া আদায়ের দিন। এরশাদ হয়েছে :

وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ

"তোমরা গুটি কয়েক দিনে আল্লাহকে স্মরণ করবে।"[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারি (রহ:) বলেন:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ... الأيام المعدودات: أيام التشريق .

ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন 'গুটি কয়েকদিন' বলতে আইয়ামুত-তাশরীককে বুঝানো হয়েছে।"[২]

ইমাম কুরতুবি (রহ:) বলেন : 'ইবনে আব্বাস (ﷺ) এর এ ব্যাখ্যা গ্রহণে কারো কোনো দ্বি-মত নেই।'[৩] অবশ্য হজ মৌসুমে এ দিনগুলো মিনায় অবস্থানের দিন। কেননা হাদিসে এসেছে: 'মিনায় অবস্থানের দিন হল তিনটি। যদি কেহ তাড়াতাড়ি করে দু দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই।'[৪]

আইয়ামুত তাশরীক বিষয়ে হাদিসে এসেছে, রসূলে কারিম (ﷺ) বলেছেন: **'আইয়ামুত-তাশরীক খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকিরের দিন।'**[৫]

ইমাম ইবনে রজব (রহ:) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন: আইয়ামুত-তাশরীক এমন কতগুলো দিন যাতে ঈমানদারদের দেহের নেয়ামত ও স্বচ্ছন্দ এবং মনের নেয়ামত তথা স্বচ্ছন্দ একত্র করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া হল দেহের খোরাক আর আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়া হল হৃদয়ের খোরাক। আর এ ভাবেই নেয়ামতের পূর্ণতা লাভ করল এ দিন সমূহে।

(২) তাশরীকের দিনগুলো ঈদের দিন হিসেবে গণ্য।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আরাফা দিবস, কুরবানির দিন ও মিনার দিনগুলো (কুরবানি পরবর্তী তিন দিন) আমাদের ইসলাম অনুসারীদের ঈদের দিন।'[৬]

(৩) এ দিনসমূহ জিলহজ মাসের প্রথম দশকের সাথে লাগানো। যে দশক খুবই ফজিলত-পূর্ণ। তাই এ কারণেও এর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে।

(৪) এ দিনসমূহে হজের কতিপয় আমল সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ কারণেও এ দিনগুলো ফজিলতের অধিকারী।

এ দিনগুলোতে করণীয়

এ দিনসমূহ যেমনি ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আযকারের দিন তেমনি আনন্দ-ফুর্তি করার দিন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: **"আইয়ামুত-তাশরীক হল খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর জিকিরের দিন।"** এ দিনসমূহে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেয়া নেয়ামত নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করার মাধ্যমে তার শুকরিয়া ও জিকির আদায় করা উচিত। আর জিকির আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি হাদিসে এসেছে।

(১) সালাতের পর তাকবির পাঠ করা। এবং সালাত ছাড়াও সর্বদা তাকবির পাঠ করা। আর এ তাকবির আদায়ের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে এ দিনগুলো আল্লাহর জিকিরের দিন। আর এ জিকিরের নির্দেশ যেমন হাজিদের জন্য, তেমনই যারা হজ পালনরত নন তাদেরও জন্য।

(২) কুরবানি ও হজের পশু জবেহ করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম ও তাকবির উচ্চারণ করা।

(৩) খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও শেষে আল্লাহ তা'আলার জিকির করা। আর এটা তো সর্বদা করার নির্দেশ রয়েছে তথাপি এ দিনগুলোতে এর গুরুত্ব বেশি দেয়া। এমনি ভাবে সকল কাজ ও সকাল-সন্ধ্যার জিকিরগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া।

(৪) হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ তাআলার তাকবির পাঠ করা।

(৫) এগুলো ছাড়াও যে কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় আল্লাহর জিকির করা।

---

[১] - সূরা বাকারা : ২০৩

[২] - বোখারি, ঈদ অধ্যায়

[৩] - দুরুসুল হজ : পৃ: ৩৫

[৪] - أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه (আবু দাউদ)

[৫] - عن نبيشة الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله (رواه مسلم)

[৬] - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب رواه أبو داود وصححه الألباني(আবু দাউদ)

৯ জিলহজ : উকুফে আরাফা

আরাফা দিবসের ফজিলত

জিলহজ মাসের নয় তারিখকে 'য়াউমে আরাফা'–আরাফা দিবস বলে। এক আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দিবস আরাফা দিবস। আল্লাহ তাআলা, আরাফা দিবসে, তাঁর বান্দাদেরকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'এমন কোনো দিবস নেই যেখানে আল্লাহ তাআলা আরাফা দিবস থেকে বেশি বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই নিকটবর্তী হন, ও তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন, বলেন—ওরা কী চায়?[১] অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা আরাফায় অবস্থানরতদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। তিনি বলেন, আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা আমার কাছে এসেছে এলোথেলো ও ধুলায় আবৃত অবস্থায়।[২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফার ময়দানে সূর্যাস্তের পূর্বে বেলালকে (رضي الله عنه) নির্দেশ দিলেন মানুষদেরকে চুপ করাতে। বেলাল বললেন: আপনারা রাসূলুল্লাহ (رضي الله عنه) এর জন্য নীরবতা অবলম্বন করুন। জনতা নীরব হল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'হে লোকসকল! একটু পূর্বে জিবরাইল আমার কাছে এসেছেন। তিনি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আহলে আরাফা ও আহলে মুযদালেফার জন্য আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়েছেন, ও তাদের অন্যায়ের জিম্মাদারি নিয়েছেন। ওমর দাঁড়িয়ে বললেন, য়্যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! এটা কি শুধুই আমাদের জন্য? তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য ও তোমাদের পর কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের জন্য। ওমর (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর অনুকম্পা অঢেল ও উত্তম।[৩]

আরাফা দিবস মুসলমানদের ওপর আল্লাহর দ্বীন ও নেয়ামত পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিবস। তারিক ইবনে শিহাব থেকে বুখারির এক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদিরা ওমর (ﷺ) কে বলল: আপনারা একটি আয়াত পড়েন, যদি তা আমাদের ওপর নাযিল হতো তাহলে এ দিবসে আমরা উৎসব পালন করতাম। ওমর (رضي الله عنه) বললেন, আমি অবশ্যই জানি কী উদ্দেশ্যে ও কোথায় তা নাযিল হয়েছে, এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোথায় ছিলেন যখন তা নাযিল হল। (তা ছিল) আরাফা দিবস। আর আমরা–আল্লাহর কসম– আরাফার ময়দানে। সুফয়ান বলেন, দিনটি জুমাবার ছিল কি-না, আমার সন্দেহ আছে। (আয়াতটি ছিল : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ– আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম)[৪] ([৫])

আরাফা দিবসের রোজা, পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।[৬] তবে এ রোজা হাজিদের জন্য নয়, বরং যারা হজ করতে আসেনি তাদের জন্য। হাজিদের জন্য আরাফার দিবসে রোজা রাখা মাকরুহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজের সময় আরাফা দিবসে রোজা রাখেননি। বরং সবার সম্মুখে তিনি দুধ পান করেছেন।[৭] ইকরামা থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর বাড়িতে প্রবেশ করে আরাফা দিবসে আরাফার ময়দানে থাকা

---

[১] - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ (মুসলিম : হাদিস নং ১৩৪৮)

[২] - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم انظروا إلي عبادي جاؤوني شعثا غبرا (মুসনাদে আহমদ : ২/২২৪)

[৩] - عن أنس رضي الله عنه قال : وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كانت الشمس تغرب ، فقال : يا بلال أنصت لي الناس ، فقام بلال ، فقال : أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصمت الناس . فقال : يا معشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات ، قام عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– فقال : يارسول الله هذا لنا خاصة قال : هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة ، فقال عمربن الخطاب : كثر خير الله وطاب؟
(আলমাতজার আররাবেহ : ২৩৬ ; ইবনে মুবারক হাদিসটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন)

[৪] - বোখারি : হাদিস নং ৪৬০৬

[৫] - আরাফা দিবসে দ্বীন পরিপূর্ণ করে দেয়ার অর্থ কী? এর ব্যাখ্যায় ইবনে রজব বলেন, ওই দিবসে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়া কয়েকভাবে ঘটেছে। এক. মুসলমানরা, হজ ফরয হওয়ার পর, নিরেট ইসলামী আবহে ইতোপূর্বে হজ পালন করেননি। অধিকাংশ ওলামা এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। দুই. আল্লাহ পাক হজকে (এই দিনে) ইব্রাহীমী ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনেন, এবং শিরক ও মুশরিকদেরকে বিচ্ছিন্ন করেন। অতঃপর আরাফার ওই স্থানে তাদের কেউই মুসলমানদের সাথে মিশ্রিত হয়নি।

নেয়ামতের পরিপূর্ণতা ঘটেছে আল্লাহর ক্ষমা-মার্জনা লাভের মাধ্যমে। কেননা আল্লাহর ক্ষমা ব্যতীত নেয়ামত পরিপূর্ণ হয়না। এর উদাহরণ, আল্লাহ তা'লা তাঁর নবীকে বলেন, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
যাতে আল্লাহ ক্ষমা করেন তোমার অতীতের ও ভবিষ্যতের ত্রুটি, ও পূর্ণ করে দেন তোমার ওপর তাঁর নেয়ামত। আর প্রদর্শন করেন তোমাকে সরল পথ (সূরা আল ফাতহ: ২)

[৬] - عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : يكفر السنة الماضية والباقية (মুসলিম : ১১৬৩)

[৭] - দেখুন : মুসলিম : হাদিস নং ১১২৩-১১২৩

অবস্থায় রোজা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফার ময়দানে আরাফা দিবসের রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন।[১]

উকুফে আরাফা

ফেরেশতা জিব্রিল (عليه السلام) হজের আমলসমূহ শিখিয়েছেন ইব্রাহীম (عليه السلام) কে আরাফার ময়দানে। শেখানো শেষে ইব্রাহীম (عليه السلام) কে জিজ্ঞেস করে বলেছেন, ‘ هل عرف–আপনি কি জানতে পেরেছেন?’। সেই থেকে আরাফার নাম ‘আরাফা’ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আদম ও হাওয়া পৃথিবীতে আসার পর প্রথম পরিচয় হয় আরাফার ময়দানে বলেও একটি কথা আছে।[২] আরাফা শব্দের এক অর্থ পরিচয় লাভ করা, সে হিসেবেও আরাফার নাম আরাফা হয়ে থাকতে পারে। কারও কারও মতে, যেহেতু এ ময়দানে মানুষ

আল্লাহর দরবারে গুনাহ-পাপ স্বীকার করে থাকে, এখান থেকেও আরাফা নামটির উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। কেননা عَرَفَ ধাতুরই রূপান্তরিত শব্দ اِعْتَرَفَ – ‘স্বীকার করেছে’।

আরাফার ময়দান হেরেম এলাকার বাইরে অবস্থিত। কাবা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, মসজিদুল হারাম রোড হয়ে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরাফার এই ময়দান। ১০.৪ কি.মি. জায়গা জুড়ে বিস্তৃত আরাফার ময়দান। চতুর্দিকে সীমানা-নির্ধারণমূলক উঁচু ফলক রয়েছে। ৯ জিলহজ ভোরে ফজরের সালাত মিনায় আদায় করে সূর্যোদয়ের পর ‘তালবিয়া’ পড়া অবস্থায় রওয়ানা হতে হয় আরাফা অভিমুখে। তবে বর্তমানে হজযাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফজরের পূর্বেই নিয়ে যাওয়া হয় আরাফায়। এটা নিশ্চয়ই সুন্নতের খেলাফ তবে সমস্যার কারণে এ সুন্নত ছুটে গেলে কোনো সমস্যা হবে না।

আরাফার ময়দানে প্রবেশ

আরাফার ময়দানে প্রবেশের সুন্নত তরিকা হল, মসজিদে ইব্রাহীমে[৩]– যা বর্তমানে নামিরার মসজিদ বলে খ্যাত–জোহর আসর একসাথে হজের ইমামের পিছনে আদায় করে আরাফার ময়দানে প্রবেশ করা। তবে বিশ লক্ষাধিক হাজির পক্ষে এ জাগায় অবস্থান নিয়ে জোহর আসর একসাথে পড়ে আরাফার ময়দানে প্রবেশ করা এবং উকুফ সম্পাদন করা অসম্ভব বিধায় এ সুন্নতের উপরও আমল করা সম্ভব হয় না। বর্তমান হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় হাজিদেরকে সরাসরি আরাফার ময়দানের ভেতরে পূর্বেই নিয়ে যাওয়া হয়। এতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে যদি ব্যক্তিগতভাবে কারো পক্ষে সম্ভব হয় এবং পথঘাট ভালো করে চেনা থাকে, একা একা আরাফায় সাথিদের কাছে ফিরে আসতে পারবে বলে নিশ্চিত থাকে, অথবা একা একাই মুযদালেফা গমন, রাত্রিযাপন ও সেখান থেকে মিনার তাঁবুতে ফিরে আসার মতো সামর্থ্য-সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকে তবে তার পক্ষে নামিরার মসজিদে এ সুন্নত আদায় করাই উত্তম।

আরাফার ময়দানে প্রবেশের পূর্বে গোসল করাকেও কেউ কেউ মুস্তাহাব বলেছেন। ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এরূপ করতেন। ওমর (رضي الله عنه) ও ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) ও গোসল করতেন বলে বর্ণায় এসেছে[৪]

জোহর-আসর এক সাথে আদায় প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে জোহর আসর একসাথে আদায় করেছিলেন। বিদায় হজ সম্পর্কে যাবের (رضي الله عنه) এর হাদিসে এসেছে, ‘নবী (ﷺ) উপত্যকার মধ্যখানে এলেন। তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে খোতবা দিলেন। অতঃপর আজান দেয়া হল, একামত হল, এবং তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর একামত হল এবং তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। এ দু’য়ের মাঝখানে অন্য কোনো সালাত আদায় করলেন না।[৫]

জোহর আসর একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে কেউ কেউ দশটি শর্ত লাগিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল ‘হজের ইমামের পেছনে হওয়া’। তবে এসব শর্ত লাগানোর পেছনে শক্ত কোনো দলিল নেই। বরং ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হজের ইমামের পিছনে জামাত না পেলেও তিনি জোহর-আসর একসাথে জমা করতেন, এ মর্মে সহিহ বুখারিতে একটি বর্ণনা এসেছে। বর্ণনাটির ভাষ্য হল:

كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما

---

১ - عن عكرمة قال : دخلت على أبي هريرة في بيته ، فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات (মুসনাদে আহমদ: ২/৩০৪, আহমদ শাকের বলেছেন : হাদিসটির সনদ শুদ্ধ)

২ - দেখুন : ড. মুহাম্মদ ইলয়াস গনী : তারিখু মাক্কাল মুকাররামা, পৃ:১১৫ , মাতাবেউর রাশীদ, ১৪২২ হি:

৩ - আব্বাসী খেলাফতের শুরুতে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। প্রথমে এর একটি মিনারা ছিল, বর্তমানে এর মিনারা সংখ্যা ছয়টি। রাসূলুল্লাহ (স) এ মসজিদের এখানে যোহর আসর একসাথে আদায় করে আরাফায় প্রবেশ করেছিলেন।

৪ - দেখুন : ইমাম নববী : কিতাবুল ইযাহ ফি মানাসিকিল হাজ্জি ওয়াল ওমরাহ , পৃ: ২৭২

৫ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا (মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮)

– ইবনে ওমর (ﷺ) ইমামের সাথে সালাত না পেলেও দুই সালাত একত্রে পড়তেন।[১] প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনাকারী নাফে’ (ﷺ) ইবনে ওমর (ﷺ) সম্পর্কে বলেন:

أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله

– ইবনে ওমর (র) আরাফা দিবসে ইমামের সাথে (সালাত) ধরতে না পারলে, নিজ অবস্থানের জায়গাতেই জোহর-আসর জমা করতেন।[২]

হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ দুই ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমি এখানে এলাউস্‌সুনান কিতাব থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি—

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد ، عن ابراهيم، قال: إذا صليت يوم عرفة في رحلك فصل كل واحدة من الصلاتين لوقتها، وترتحل من منزل حتى تفرغ من الصلاة، قال محمد: وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة، فأما في قولنا فإنه يصليها في رحله كما يصليها مع الإمام، يجمعها جميعا بأذان وإقامتين، لأن العصر إنما قدمت للوقوف وكذلك بلغنا عن عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وعن عطاء بن إبي رباح ، وعن مجاهد .

অর্থাৎ: (ইমাম) মুহাম্মদ বলেছেন: (ইমাম) আবু হানিফা আমাদেরকে জানিয়েছেন, হাম্মাদ, ও ইব্রাহীম এর সূত্র ধরে, তিনি বলেছেন: আরাফার দিন যদি তুমি নিজের অবস্থানের জায়গায় সালাত আদায় কর তবে দুই সালাতের প্রত্যেকটি যার যার সময়ে আদায় করবে, ও সালাত থেকে ফারেগ হয়ে নিজের অবস্থানের জায়গা থেকে প্রস্থান করবে। (ইমাম) মুহাম্মদ বলেন, (ইমাম) আবু হানিফা এ বর্ণনা অনুযায়ী আমল করেন। পক্ষান্তরে আমাদের কথা এই যে (হাজি) তার উভয় সালাত নিজের অবস্থানের জায়গায় ঠিক একই রূপে আদায় করবে যেভাবে আদায় করে ইমামের পেছনে। উভয় সালাতকে একত্রে জমা করবে, এক আজান ও দুই একামতের সাথে। কেননা সালাতুল আসরকে উকুফের স্বার্থে এগিয়ে আনা হয়েছে। এরূপই আমাদের কাছে পৌঁছেছে আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আতা ইবনে আবি রাবাহ ও মুজাহিদ থেকে।[৩]

সে হিসেবে হজের ইমামের পিছনে জামাতের সাথে সালাত আদায় সম্ভব হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় জোহর আসর একত্রে পড়া সুন্নত।

ইমামুল হজের শর্ত লাগানোর পেছনে একটি যুক্তি এই দেখানো হয় যে, রাসূল (ﷺ) ছিলেন ইমামুল হজ আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। তাই ইমামুল হজের পেছনে জামাতের সাথে সালাত আদায় না করলে জমা করা যাবে না। এই বিষয়টি প্রমাণের ক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রের ‘মাফহুমুল মুখালাফার’ আশ্রয় নেয়া হয়েছে যা হানাফি মাজহাবে দলিল হিসেবে গণ্য নয়।

আরাফা দিবসের মূল আমল ‘দোয়া’।

আরাফা দিবসের মূল আমল দোয়া। দোয়ার কিছু আদব ও কায়দা-কানুন আছে যেগুলোর অনুসরণ দোয়া কবুলে সহায়ক হতে পারে। নীচে দোয়ার কিছু আদব উল্লেখ করা হল।

১. **শুদ্ধ নিয়ত:** অর্থাৎ দোয়া আরম্ভের সময় মনে মনে নিয়ত করবেন যে আপনি একটি মহৎ ইবাদত বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন। কেননা ‘দোয়াই ইবাদত’ বলে হাদিসে এসেছে।[৪] মনে মনে এ ধরনের ভাবও উদ্রেক করবেন যে একমাত্র আল্লাহই সমস্ত হাজত পুরা করতে পারেন। হাজত-প্রয়োজন পুরা করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

২. **ওজু অবস্থায় দোয়া করা**। কেননা ওজু ব্যতীত দোয়া করা জায়েয হলেও যেহেতু দোয়া একটি ইবাদত তাই ওজু অবস্থায় করাই উত্তম।

৩. **হাতের তালু চেহারার দিকে ফিরিয়ে দোয়া করা**। হাদিসে এসেছে, ‘আল্লাহর কাছে তোমরা যখন সওয়াল করবে, হাতের তালু দিয়ে সওয়াল করবে। হাতের পিঠ দিয়ে নয়।[৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দোয়া করার সময় হাতের তালু চেহারার দিকে রাখতেন।[৬] প্রয়োজন ও হাজত প্রকাশের এটাই হল সর্বোত্তম ধরন, যাতে একজন অভাবী ব্যক্তি পাবার আশায় দাতার দিকে বিনয়াবনত হয়ে হাত বাড়িয়ে রাখে।

---

[১] - বোখারি : ১৬৬২ নং হাদিসের পূর্বের অংশ

[২] - দেখুন : জাফার আহমদ উসমানী : এলাউস্‌সুনান, খন্ড :৭ , পৃ:৩০৭৩ , দারুল ফিকর, বইরুত, ২০০১

[৩] - দেখুন : জাফার আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত, খন্ড : ৭ , পৃ: ৩০-৭৩

[৪] - الدعاء هو العبادة (তিরমিযী : হাদিস নং ৩২৯৪)

[৫] - قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ، ولا تسألوه بظهورها (আবু দাউদ : ১৪৮৬)

[৬] - كان إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجهه (তাবারানী : ১১/১২২৩৪)

৪. **হাত এতটুকু উঁচুতে ওঠাবেন যাতে বগলের নীচ দেখা যায়।** হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি তার হাত এতটুকু উঠায় যে, তার বগলের নীচ দৃশ্যমান হয়ে উঠে এবং আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করে, আল্লাহ তার আর্জি পূরণ করেন।[১]

৫. **আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার মাধ্যমে দোয়া শুরু করা**। রাসূলুল্লাহ (স) অধিকাংশ সময় এভাবেই দোয়া করতেন। এমনকী কেয়ামতের ময়দানে আরশের কাছে সিজদায় রত হয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বয়ান করবেন, এরপর আল্লাহ তাঁকে সওয়াল করার অনুমতি দেবেন, ও বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা শোনা হবে। সওয়াল কর দেয়া হবে। শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত মঞ্জুর করা হবে। [২]

৬. **নবী (স) এর প্রতি দরুদ পাঠ করা**। কেননা দরুদ ব্যতীত দোয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। হাদিসে এসেছে, 'প্রত্যেক দোয়া নবী (স) প্রতি দরুদ না পড়া পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে।[৩]

৭. **প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করা**। পবিত্র কুরআনে এর কিছু উদাহরণ এসেছে, যেমন; رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ –হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন ও আমার মাতাপিতাকে।[৪] قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي –সে বলল, হে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করুন ও আমার ভাইকে।[৫]

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের ভাইদেরকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছেন।[৬] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও কারো জন্য দোয়া করলে প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন। [৭]

৮. **দোয়া করার সময় কোনো ইতস্তত না করা**। এরূপ না বলা যে হে আল্লাহ তুমার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দোয়া কবুল করো। যদি ইচ্ছা হয় তবে রহম করো। যদি ইচ্ছা হয় আমাকে রিজিক দাও। বরং দৃঢ়-প্রত্যয়ী হয়ে দোয়া করা। [৮]

৯. **মন-মস্তিষ্ক জমিয়ে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে দোয়া করা**। কেবল মুখে মুখে শব্দ উচ্চারণ করে না যাওয়া। হাদিসে এসেছে, 'দোয়া কবুল হবে এই একীন নিয়ে আল্লাহর কাছে চাও। জেনে রাখো, আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন দোয়া কবুল করেন না যা গাফেল ও উদাসীন হৃদয় থেকে বের হয়।[৯]

১০. **একীনের সাথে দোয়া করা**। কেননা আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছেন, এরশাদ হয়েছে,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .

– যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, যে আমি নিকটেই। আহ্বানকারীর আহ্বানে আমি সাড়া দেই যখন সে আহ্বান করে।[১০] ওপরে বর্ণিত হাদিসেও উল্লেখ হয়েছে যে, 'তোমরা কবুল হওয়ার একীন নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো।' [১১]

১১. **দোয়ার সময় সীমা লঙ্ঘন না করা**। অর্থাৎ অতিরঞ্জিত আকারে দোয়া না করা। সা'দ (র) তাঁর এক ছেলেকে এই বলে দোয়া করতে শুনলেন যে, হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছি। জান্নাতের সকল নেয়ামত চাচ্ছি। ও.. ও..। আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি। জাহান্নামের শেকল ও বেড়ি সমূহ থেকে পানাহ চাচ্ছি। ও.. ও। সা'দ বলেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি: এমন সম্প্রদায় আসবে যারা তাদের দোয়ায় সীমা-লঙ্ঘন করবে।[১২] সাবধান তুমি তাদের দলভুক্ত হবে না। তোমাকে যদি জান্নাত দেয়া হয় তাহলে এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু সমেত দেয়া হবে। আর যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় তাহলে জাহান্নাম ও তার মধ্যে যতো খারাপি আছে তার থেকে মুক্তি দেয়া হবে।[১৩]

১২. **আল্লাহর দরবারে হীনতা-দীনতা ও অপারগতা প্রকাশ করা।** সকল ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। উপকার ও অনুপোকারের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ যদি কারও কল্যাণ করতে না চান তাহলে সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষ মিলেও তার কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না। আর যদি তিনি কারো উপকার করতে চান তাহলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলেও তা ঠেকাতে

---

[১] - ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله مسألة إلا أتاها إياه.. (তিরমিযী : ৩৬০৩) মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দিন আলবানী এ হাদিসটি সহিহ বলেছেন (দ্রঃ সহিহুত্তিরমিযী :২৮৫৩)

[২] - বোখারি : হাদিস নং ৭৫১০ , মুসলিম : হাদিস নং ১৯৩

[৩] - كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي (দায়লামী : ৩/৪৭৯১, সহিহুল জামে' : ৪৫২৩)

[৪] - সূরা নূহ : ২৮

[৫] - সূরা আল আ'রাফ : ১৫১

[৬] - সূরা আল হাশর : ১০

[৭] - আবু দাউদ : হাদিস নং ৩৯৮৪

[৮] - দ্র ঃ বোখারি : হাদিস নং ৬৩৩৯

[৯] - أدعو الله تعالى و أنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه (তিরমিযী : ৩৪৭৯ ; সহিহুত্তিরমিযী : ২৭৬৬)

[১০] - সূরা আল বাকারা : ১৮৬

[১১]- তিরমিযী : ৩৪৭৯ ; সহিহুত্তিরমিযী : ২৭৬৬

[১২] - سيكون قوم يعتدون في الدعاء (আহমদ : ১/১৭২)

[১৩] - আহমদ : ১/১৭২

পারবে না। এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে নিজেকে একেবারে হীন ও দুর্বল ভেবে আল্লাহর কাছে সওয়াল করতে হবে। আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা আর আমি অতি নগণ্য, অনুল্লেখযোগ্য একজন দাস, বান্দা। আল্লাহ হলেন ধনী আমি গরিব, অক্ষম। তিনি পবিত্র ও সকল অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। আর আমি আদ্যোপান্ত অসম্পূর্ণ। একমাত্র তিনিই বিধান দাতা আমি বিধান গ্রহীতা। এ ধরনের মন-মানসিকতা নিয়ে দোয়া করতে হবে।

১৩. পরিব্যাপ্ত ও নবী (স) থেকে বর্ণিত শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যাপ্ত, 'জামে'। এক বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পরিব্যাপ্ত দোয়া পছন্দ করতেন, ও অন্যগুলো ছেড়ে দিতেন।[১]

১৪. পরিত্রাণ পাওয়ার দোয়া অধিক পরিমাণে করা। কেননা দুনিয়া ও আখেরাতে যে ব্যক্তি পরিত্রাণ পেয়ে গেল তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ হতে পারে না। হাদিসে এসেছে, 'পরিত্রাণের দোয়া বেশি,বেশি করো'।[২]

১৫. দোয়া কবুলের জন্য মাধ্যম হিসেবে কিছু পেশ করা। যেমন আল্লাহর নাম ও সিফাত-গুনাবলীর উসিলায় দোয়া তলব করা। এরশাদ হয়েছে,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا .

১৬. –আল্লাহর আছে সুন্দর নাম-সমগ্র, সেগুলো দিয়ে তাঁকে ডাকো।[৩] নিজের কৃত কোনো সৎকাজকে উসিলা করে দোয়া চাওয়া। এর উদাহরণ পবিত্র কুরআনে খোঁজে পাওয়া যায়। এরশাদ হয়েছে—

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

–হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বানকারীকে শুনতে পেয়েছি, তিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করছেন, বলছেন, ঈমান আনো তোমাদের রবের প্রতি। অতঃপর ঈমান এনেছি। তাই, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করুন, ও সৎ ব্যক্তিদের অনুগামী করে আমাদের মৃত্যু নসিব করুন।[৪] তবে এ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো ব্যক্তিকে উসিলা বানিয়ে দোয়া করা কখনো উচিত নয়। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তাঁদের জন্য দোয়া করতে বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওফাতের পর আব্বাস (رضي الله عنه) কে দোয়া করতে বলেছেন। এরূপ করাকেই বলা হয় দোয়ার ক্ষেত্রে কাউকে উসিলা বানানো। সৎ ব্যক্তিদেরকে দিয়ে দোয়া করানোর এ পদ্ধতি এখনও অবলম্বন করা যায়।[৫] তবে এরূপ বলা কখনো শরিয়তসম্মত নয় যে, হে আল্লাহ অমুক ব্যক্তির উসিলায় আমার দোয়া কবুল করুন।

১৭. দোয়া করার সময় বেশি বেশি 'ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম' বলা। হাদিসে এসেছে, '(তোমাদের দোয়ায়) বেশি বেশি য়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম বলো।[৬]

১৮. ইসমে আজম দিয়ে দোয়া করা। এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে এই বলে দোয়া করতে শুনলেন যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সওয়াল করছি (এই একীন নিয়ে) যে আপনি আল্লাহ, অদ্বিতীয় ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে জন্ম দেননি, কারও থেকে জন্ম গ্রহণও করেননি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, লোকটি আল্লাহর ইসমে আজম দিয়ে সওয়াল করেছে। যার দ্বারা সওয়াল করলে আল্লাহ দান করেন, দোয়া করলে কবুল করেন।[৭] এক. হাদিসে এসেছে, 'ইসমে আজম এ দুটি আয়াতে রয়েছেঃ এক.

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ [৮]

১৯. দুই. সূরা আল ইমরানের শুরুর আয়াত।[৯]

২০. বেশি বেশি চাওয়া এবং অতিমাত্রায় অনুনয়-বিনয় করা। হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের কেউ যখন সওয়াল করবে সে যেন বেশি মাত্রায় করে। কেননা সে আল্লাহর কাছে সওয়াল করছে।'

২১. কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবলামুখী হয়ে দোয়া করতেন।[১০] দোয়ার কেবলা আকাশ বলে যে একটি কথা আছে, তা ঠিক নয়।

---

[১] - كان يستحب جوامع من الدعاء ، ويدع ما سوى ذلك (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৪৮২; সহীহু আবি দাউদ: ১৩১৫)

[২] - সহীহুল জামে': হাদিস নং ১১৯৮

[৩] - সূরা আল আরাফ : ১৮০

[৪] - সূরা আল ইমরান: ১৯৩

[৫] - দ্রঃ আব্দুল আযীয বিন ফাতহি আস্‌সাইয়িদ নাদা : মাওসুয়াতুল আদাব আল ইসলামিয়া, পৃ : ৩৬৪

[৬] - সহিহুত্তিরমিযী : ২৭৯৭

[৭] - سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد .فقال رسول الله : لقد سأل الله باسمه الأعظم ، الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دعي به أجاب (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৪৯৩; সহীহু আবি দাউদ : ১৩২৪)

[৮] - সূরা আল বাকারা : ১৬১

[৯] - আবু দাউদ : ১৪৯৬ ; ইবনে মাযাহ : ৩৮৫৫; সহিহু ইবনে মাযাহ :৩১০৯

[১০] - মুসলিম : হাদিস নং ২১৩৭

২২. দোয়া শেষ হলে 'আমীন' বলা।

আরাফা দিবসের উত্তম দোয়া

হাদিসে এসেছে, উত্তম দোয়া হল আরাফা দিবসের দোয়া, এবং আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের সর্বোত্তম কথা হল—

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

–আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই, প্রশংসাও তাঁর। এবং তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।[১] আরাফার ময়দানে এই দোয়াটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেশি বেশি পড়েছেন।[২]

সংক্ষেপে উকুফে আরাফার নিয়ম

১. সম্ভব হলে আরাফার ময়দানে প্রবেশের পূর্বে বা পরে গোসল করে নেয়া।

২. যোহরের সময়ে জোহর-আসর একসাথে, এক আজান ও দুই একামতে কাসর করে আদায় করা। আসর ও যোহরের আগে পরে কোনো সুন্নত নফল সালাত আদায় না করা। সালাতের সময় নারীরা পুরুষের পেছনে একই জমাতে শরিক হতে পারবেন।

৩. সালাত শেষে দোয়া-মুনাজাতে ব্যস্ত হওয়া। দাঁড়িয়ে-বসে-চলমান অবস্থায় তথা সকল পরিস্থিতিতে দোয়া ও জিকির চালু রাখা। কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসিহতের বৈঠকে শরিক হওয়া ইত্যাদিও উকুফে আরাফার আমলের মধ্যে শামিল হবে। তবে নারীদের ক্ষেত্রে কেবল চুপি স্বরে বসে বসে দোয়া-জিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে।

৪. ক্লান্তি চলে এলে সহযাত্রী হাজিদের সাথে কল্যাণকর আলাপচারিতার মাধ্যমে ক্লান্তি দুর করা যেতে পারে। অথবা ভালো কোনো ধর্মীয় বই পড়েও কিছু সময় কাটানো যেতে পারে।

৫. যারা দিনের বেলায় উকুফে আরাফা করবে তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া-জিকির তথা উকুফ চালিয়ে যাবে। আর যারা ৯ তারিখ দিবাগত রাতে আরাফার ময়দানে আসবে, সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সামান্য সময় অবস্থান করলেই উকুফ হয়ে যাবে।

৬. নারীদের পর্দা-পুশিদার ব্যাপারে সজাগ থাকা। কাপড় দিয়ে পর্দা টানিয়ে তার মধ্যে অবস্থান করা। বেগানা পুরুষের সামনে ওড়না বা চাদর ঝুলিয়ে চেহারা ঢেকে দেয়া। হাতও চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা। কেননা নারীর জন্য নেকাব ব্যবহার করে চেহারা ঢাকা ও হাত মোজা ব্যবহার করে হাত ঢাকা এহরাম অবস্থায় নিষেধ। তবে অন্য কিছু ব্যবহার করে ঢাকা নিষেধ নয়।

৭. আরাফার ময়দানের ভেতরে উকুফ হচ্ছে কি-না সে ব্যাপারে সজাগ থাকা। কেননা আরাফার বাইরে উকুফ করলে হজ হবে না।

৮. জাবালে আরাফায় উঠার কোনো বিধান নেই। তাই এ পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করা উচিত নয়। জাবালে আরাফার দিকে মুখ করে দোয়া করাও খেলাফে সুন্নত।

৯. উকুফে আরাফা হজের শ্রেষ্ঠতম আমল। হাদিসে এসেছে الحج عرفة। **–হজ হল আরাফা।**[৩] তাই এই পবিত্র দিবসে যেন কোনো প্রকার পাপের সাথে জড়িয়ে না যান সে ব্যাপারে কঠিনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাই উচিত হবে সহযাত্রী হাজিদেরকে নিয়ে খোশগল্পে না বসা। কেননা এ ধরনের আসরে নিজের অজান্তেই গিবত-পরনিন্দার মতো জঘন্য পাপের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে নেয়া হয়।

১০. এ দিবসে বেশি বেশি দান-খয়রাত করার চেষ্টা করা উচিত। তাই সহযাত্রীদের প্রয়োজনে আপনার হাত প্রসারিত করুন। সঙ্গে করে কিছু শুকনো খাবার নিয়ে যাবেন যেগুলো দিয়ে প্রয়োজনের সময় আপ্যায়ন করবেন।

১১. সম্ভব হলে কিছু সময় উন্মুক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে দোয়া করুন।

মুযদালেফার পথে রওয়ানা

৯ জিলহজ সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর রওয়ানা হতে হয় আরাফা থেকে মুযদালেফার উদ্দেশ্যে। মাগরিবের সালাত আরাফার ময়দানে না পড়েই রওয়ানা হতে হয়, কেননা মুযদালিফায় গিয়ে এশার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে মাগরিবের সালাত। রওয়ানা হতে হয় ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে।

---

[১] -তিরমিযী : হাদিস নং ৩৫৮৫

[২] - আহমদ : হাদিস নং ৬৯৬১

[৩] - الحج عرفة (মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৩৫)

আরাফার সীমানা শেষ হলেই মুযদালেফা শুরু হয় না। আরাফা থেকে প্রায় ৬ কি.মি. পথ অতিক্রম করার পর আসে মুযদালেফা। মুযদালেফার পর ওয়াদি আল-মুহাস্‌সার। এরপর মিনা। আরাফা থেকে যেতে দু পাশে সামনাসামনি দুটি পাহাড় পড়বে। ওয়াদি মুহাস্‌সার থেকে এ পাহাড়-দ্বয় পর্যন্ত মুযদালেফা। মুযদালেফার শুরু ও শেষ নির্দেশকারী বোর্ড রয়েছে।

বর্তমানে মুযদালেফার একাংশ মিনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ননব্যালটি অধিকাংশ বাংলাদেশি হাজিদের মিনার তাঁবু মুযদালিফায় অবস্থিত। এই জায়গাটুকু মিনা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও যেহেতু মৌলিক অর্থে মিনায় পরিণত হয়নি, তাই এই অংশে রাত্রিযাপন করলেও মুযদালেফার রাত্রিযাপন হয়ে যাবে।

মুযদালিফায় করণীয়

মুযদালিফায় পৌঁছার পর প্রথম কাজ হল মাগরিব ও এশা এক সাথে আদায় করা। মাগরিব ও এশা উভয়টা এক আজান ও দুই একামতে আদায় করতে হবে।[১] আজান দেয়ার পর একামত দিয়ে প্রথমে মাগরিবের তিন রাকা'ত সালাত আদায় করতে হবে। এরপর সুন্নত নফল না পড়েই এশার উদ্দেশ্যে একামত দিয়ে এশার দু'রাকা'ত কসর সালাত আদায় করতে হবে। ফরজ আদায়ের পর বেতরের সালাতও আদায় করতে হবে। মাগরিবের সালাত মুযদালিফায় পৌঁছার সাথে সাথেই আদায় করা উচিত। গাড়ি থেকে মাল-সামানা নামানোর প্রয়োজন হলে মাগরিবের সালাত পড়ে তারপর গিয়ে নামাবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজের সময় মাগরিবের সালাত আদায় করে তারপর যার যার উট যেখানে অবস্থান করবে সেখানে বসিয়েছেন। এরপর এশার সালাত আদায় করেছেন।[২]

খেয়াল রাখতে হবে যে মুযদালিফায় পৌঁছার পর যদি এশার সালাতের সময় না হয় তবে অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, এক বর্ণনা অনুসারে, মুযদালেফার রাতে মাগরিবের সময় পরিবর্তন করে এশার ওয়াক্তে নিয়ে নেওয়া হয়েছে।[৩] মাগরিবের সালাতের পর কোনো সুন্নত বা জিকির নেই। তবে এশার পর বেতরের তিন রাকাত সালাত আদায় করতে হবে। সালাত আদায়ের পর অন্য কোনো কাজ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজের সময় সুবহে সাদেক পর্যন্ত শুয়ে আরাম করেছেন।[৪] যেহেতু ১০ জিলহজ হাজি সাহেবকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুযদালেফার রাতে আরাম করার বিধান রেখেছেন। তাই যারা বলেন যে, মুযদালেফার রাত ঈদের রাত, যা ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে কাটিয়ে দেয়া উচিত, তাদের কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নত মোতাবেক না হওয়ায় আমলযোগ্য নয়।

তবে এক ফাঁকে কঙ্কর কুড়িয়ে নিতে পারেন। কেননা মিনায় গিয়ে কঙ্কর খুঁজে পাওয়া রীতিমতো কষ্টের ব্যাপার। তবে মুযদালেফা থেকেই কঙ্কর নিতে হবে এ ধারণা ঠিক নয়।[৫] মটরশুঁটির আকারের কঙ্কর নেবেন যা আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করা যায়।[৬] ৭০ টি কঙ্কর কুড়াবেন। কঙ্কর পানি দিয়ে ধুইতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কঙ্কর ধুয়েছেন বলে কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না।

মুযদালিফায় থাকাবস্থায় সুবহে সাদেক উদিত হলে আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের সালাত আদায় করে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দোয়ায় মশগুল হবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবশ্য ফজরের সালাত আদায়ের পর 'কুযা' পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হতেন ও উকুফ করতেন। এ স্থানটি বর্তমানে মাশআরুল হারাম মসজিদের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। এ মসজিদটি মুযদালেফার ৫ নং রোডের পাশে অবস্থিত, এবং ১২ হাজার মুসল্লি ধারণ ক্ষমতা রাখে। মসজিদটির পশ্চাৎ ভাগে ৩২ মিটার উঁচু দু'টি মিনারা রয়েছে অনেক দূর থেকেই যা স্পষ্ট দেখা যায়। এ মসজিদের এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উকুফ করেছেন এবং

---

[১] - জাবের (رضي الله عنه) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন,' أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر নবী (স) মুযদালিফায় এলেন, সেখানে তিনি মাগরিব ও এশা এক আযান ও দুই একামতসহ আদায় করলেন। এ দুয়ের মাঝে কোনো তাসবীহ পড়লেন না । অতঃপর শুয়ে গেলেন এ পর্যন্ত যে ফজর (সুবহে সাদেক) উদিত হল। (মুসলিম)

[২] - বোখারি : ১৫৬০, মুসলিম : ২২৫৬

[৩] - إن هاتين الصلاتين قد حولتا عن وقتهما في هذا المكان – (বোখারি)

[৪] - أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر – নবী (ﷺ) মুযদালিফায় এলেন, সেখানে তিনি মাগরিব ও এশা এক আযান ও দুই একামতসহ আদায় করলেন। এ দুয়ের মাঝে কোনো তাসবীহ পড়লেন না । অতঃপর শুয়ে গেলেন এ পর্যন্ত যে ফজর (সুবহে সাদেক) উদিত হল। (মুসলিম)

[৫] - রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন জায়গা থেকে কংকর নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। কারও কারও মতে তিনি জামারাত এর কাছ থেকে কংকর নিয়েছিলেন (দ্রঃ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিনঃ মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরা, পৃঃ ১৩০) তবে মুযদালিফা থেকে যে নেননি তা একটি হাদিস থেকে স্পষ্ট। হাদিসটিতে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন যে রাসূলূল্লাহ (ﷺ) আমাকে আকাবা দিবসের – ১০ যিলহজ–সকালে সোওয়ারের ওপর থাকাবস্থায় বললেন, 'নাও , আমার জন্য কংকর কুড়াও (আহমদ) ১০ যিলহজ সকালে তিনি অবশ্যই মুযদালিফায় ছিলেন না। তবে সাহাবী ইবনে ওমর (رضي الله عنه) মুযদালিফা থেকে কঙ্কর কুড়িয়ে নিতেন বলে একটি বর্ণনায় এসেছে (দেখুন : সাইয়িদ সাবেক : ফিকহুস্‌সুন্নাহ, খন্ড : ১, পৃঃ ৭২৯) সে হিসেবে মুযদালিফা থেকে কঙ্কর নেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই তবে তা জরুরি মনে না করা ও মুযদালিফার কঙ্করের বিশেষ কোন গুণ আছে, এ ধরনের কোনো ধারণা পোষণ না করা।

[৬] - আলাবানী : সহিহুন্নাসায়ী : ২/২৪০

বলেছেন আমি এখানে উকুফ করলাম তবে মুযদালেফা পুরোটাই উকুফের স্থান।[১] সম্ভব হলে উক্ত মসজিদের কাছে গিয়ে উকুফ করা ভাল।

উক্ত মসজিদের কাছে গিয়েই হোক বা যেখানে অবস্থান করছেন সেখানেই হোক ফজরের সালাত আদায়ের পর দোয়ায় মশগুল হবেন ও খুব ফরসা হওয়া পর্যন্ত দোয়া ও জিকির চালিয়ে যাবেন। এরপর সূর্যোদয়ের আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।[২]

দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য মধ্যরাতের পর চাঁদ ডুবে গেলে মুযদালেফা থেকে প্রস্থান করার অনুমতি আছে। ইবনে ওমর (ﷺ) তাঁর পরিবারের মধ্যে যারা দুর্বল তাদেরকে এগিয়ে দিতেন। রাতের বেলায় তারা মুযদালিফায় মাশআরুল হারামের নিকট উকুফ করতেন। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহর জিকির করতেন। তারা ইমামের উকুফ ও প্রস্থানের পূর্বেই মুযদালেফা থেকে ফিরে যেতেন। তাদের মধ্যে কেউ ফজরের সালাতের সময় মিনায় গিয়ে পৌঁছাতেন। কেউ পৌঁছাতেন তারও পর। তারা যখন মিনায় পৌঁছাতেন কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। ইবনে ওমর (ﷺ) বলতেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এদের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।[৩] মুযদালিফায় উকুফ করা ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনে এসেছে—

‘فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

-তোমরা যখন আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করবে, মাশআরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে, এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও তোমরা ইতিপূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।[৪] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুযদালিফায় উকুফ করেছেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি মুযদালেফা ত্যাগ করেছেন। তাই আমাদেরও উচিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে মুযদালিফায় রাতযাপন করেছেন, উকুফ করেছেন, ঠিক একই রূপে রাতযাপন ও উকুফ করা।

মুযদালিফায় অবস্থানের ফজিলত

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুযদালিফায় অবস্থানের ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা এই দিনে তোমাদের ওপর অনুকম্পা করেছেন, অতঃপর তিনি গুনাহ্গারদেরকে সৎকাজকারীদের কাছে সোপর্দ করেছেন। আর সৎকাজকারীরা যা চেয়েছে তা তিনি দিয়েছেন।[৫]

মিনায় পৌঁছার পূর্বে ওয়াদি মুহাস্‌সার (মুহাস্‌সার উপত্যকা) সামনে আসবে। ওয়াদি মুহাস্‌সারের সীমানা নির্ধারক ফলক রয়েছে যেখানে وادي محسر লেখা আছে। এখানে আবরাহা রাজার হাতির বাহিনী ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার স্থান হিসেবে, অন্যান্য আযাব নাযিলের স্থানের মতো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এখানেও দ্রুত চলে পার হয়ে গেছেন। সে হিসেবে মুহাস্‌সার উপত্যকায় এলে দ্রুত চলে পার হয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন দ্রুত চলতে গিয়ে অন্যদের কষ্ট না হয়। বর্তমানে অবশ্য ওয়াদি মুহাস্‌সারে তাঁবু টানিয়ে, মিনার দিনগুলোয়, হাজিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। মিনার মূল এরিয়ায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বিজ্ঞ ওলামাদের পরামর্শ ক্রমে এরূপ করা হয়েছে। তাই আপনার তাঁবু যদি ওয়াদি মুহাস্‌সারে অবস্থিত থাকে তা হলে এ জায়গাটুকু দ্রুত পার হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি বরং এখানেই থেমে যাবেন, এবং নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করবেন।

মিনায় পৌঁছে করণীয়

আজ ১০ জিলহজ। হজের বড়ো দিন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দিন সাহাবিগণকে প্রশ্ন করে বলেছিলেন, ‘এটা কোন দিন?’ উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন, ‘এটা য়াইমুন্নাহর–কোরবানির দিন। রাসূলুল্লাহ বললেন, ‘এটি হজের বড়ো দিন’[৬] বছরের সর্বোত্তম দিবস। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ‘আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কাছে সর্বোত্তম দিবস হল কোরবানির দিন। তারপর পরের দিন।[৭] এই দিনে হজের চারটি কাজ অনুষ্ঠিত হয়, যারা হাজি নয় তাদের জন্য ঈদের সালাত ও কোরবানি একত্রিত হয়। সে হিসেবে এই দিনের মর্যাদা অত্যন্ত বেশি। তাই হজ-পালনকারী ভাগ্যবান ব্যক্তির উচিত যথাযথ সম্মানের সাথে ও সমস্ত পাপ ও গুনাহ হতে মুক্ত থেকে এ দিনটি অতিবাহিত করা।

---

[১] - মুসলিম : ২/৮৯৩

[২] - জাবের (ﷺ) থেকে বর্ণীত হাদিসে এসেছে—

أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، ولم يزل واقفا ، حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس

[৩] - كان عبدالله بن عمر رضي اللهم عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي اللهم عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (বোখারি : হাদিস নং ১৫৬৪)

[৪] - সূরা আল বাকারা : ১৯৮

[৫] - إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم (ইবনু মাজাহ : ৩০২৩)

[৬] - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر : أي يوم هذا ؟ قالوا يوم النحر ، قال : هذا يوم الحج الأكبر (আবু দাউদ: হাদিস নং ১৯৪৫) আলবানি এ হাদিসটিকে শুদ্ধ বলেছেন।

[৭] - আবু দাউদ : হাদিস নং ১৭৬৫ ; আলাবানী হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

১০ জিলহজের আমলসমূহ

১.বড় জামরায় ৭ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা।
২. হাদী জবেহ করা।
৩. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।
৪.তাওয়াফে যিয়ারা সম্পন্ন করা।

প্রথম আমল: কঙ্কর নিক্ষেপ

কঙ্কর নিক্ষেপের সময়সীমা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সূর্য ওঠার প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা পর কঙ্কর মেরেছিলেন।[১] সে হিসেবে এ সময়টাতেই ১০ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ করা সুন্নত। সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ-সুন্নত সময় চলতে থাকে। সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে শুরু করে ১১ তারিখের সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত জায়েয। বর্তমান-যুগে বিশ লক্ষাধিক হজ পালনকারীর ভিড়ে সুন্নত সময়ে কঙ্কর মারা দুঃসাধ্য না হলেও অনেকের পক্ষেই কষ্টকর। তাই প্রথমে খবর নিন কখন ভিড় কম থাকে। অনেক সময় সকাল-বেলা ভিড় কম থাকে। কেননা অনেকেই ভাবেন যে এখন মনে হয় প্রচণ্ড ভিড়, তাই পরে যাই। আবার অনেক সময় সকাল-বেলায় প্রচণ্ড ভিড় থাকে। তাই উচিত হবে, ভিড় আছে কি-না, তা খবর নিয়ে দেখা।

১০ জিলহজ সূর্যোদয় থেকে শুরু করে ১১ জিলহজ সুবহে সাদেক উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কঙ্কর মারা চলে, এটাই আপনি মাথায় রাখুন। এ সময়ের মধ্যে যখন ভিড় কম বলে খবর পাবেন তখনই কঙ্কর মারতে যাবেন।

নারীদের জন্য ১০ তারিখ সূর্য ওঠার আগেও কঙ্কর নিক্ষেপ চলে।[২] তবে বর্তমানে এ সময়টায় পথঘাটে প্রচণ্ড ভিড় থাকে। যার কারণে এ সময়ে জামারাতে গিয়ে কঙ্কর মেরে ফিরে আসা কঠিন ব্যাপার। তবে বিকেল বেলায় ও রাতে সাধারণত ফাঁকা থাকে। তাই নারীদের জন্য এ সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ সহজ।

কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি

তালবিয়া পড়ে পড়ে জামারাতের দিকে এগোবেন। মিনার দিক থেকে তৃতীয় ও মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরায়– যাকে জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা) বলা হয়–৭ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। কাবা ঘর বাঁ দিকে ও মিনা ডান দিকে রেখে দাঁড়াবেন। আল্লাহ আকবার (الله أكبر) বলে প্রতিটি কঙ্কর ভিন্ন ভিন্নভাবে নিক্ষেপ করবেন। খুশুখুজুর সাথে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর একটি শাআয়ের বা নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কালামে পাকে এসেছে,

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِّ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

–এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে তাজিম করলে তার হৃদয়ের তাকওয়ার কারণেই তা করে থাকে।'[৩] হাদিসে এসেছে, 'বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ ও জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর জিকির কায়েমের উদ্দেশ্যে।[৪] সে হিসেবে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ধীরস্থিরতা বজায় রাখা জরুরি, যাতে আল্লাহর নিদর্শনের অসম্মান না হয়। রাগ-রোষ নিয়ে জুতো কিংবা বড় পাথর নিক্ষেপ করা কখনো উচিত নয়। জামারাতে শয়তান বাঁধা আছে বলে যে কেউ কেউ ধারণা করেন তা ঠিক নয়।

কঙ্কর নিক্ষেপের ফজিলত

হাদিসে এসেছে, 'আর তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ, সে তো তোমার জন্য সঞ্চিত করে রাখা হয়।[৫]

দুর্বল ও নারীদের কঙ্কর নিক্ষেপ

---

[১] - عن جابر قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ضحى ورمي بعد يوم النحر إذا زالت الشمس (নাসায়ী : হাদিস নং ৩০১৩)
[২] - দেখুন মুসলিম : হাদিস নং ১২৯০
[৩] - সূরা আল হাজ্জ : ৩২
[৪] - إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৬১২)
[৫] - وأما رميك للجمار فإنه مذخور لك (মুসলিম : হাদিস নং ১৩৪৮)

যারা দুর্বল অর্থাৎ হাঁটা-চলার ক্ষমতা রাখে না, তারা নিজের কঙ্কর অন্যকে দিয়ে মারাতে পারেন। এক্ষেত্রে যিনি প্রতিনিধি হবেন তাকে অবশ্য হজ পালনকারী হতে হবে, এবং নিজের কঙ্কর প্রথমে মেরে, পরে অন্যেরটা মারতে হবে।

নারী মাত্রই দুর্বল এ কথা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে উম্মাহাতুল মুমিনিন সকলেই ছিলেন। তাঁদের সবাই নিজের কঙ্কর নিজেই মেরেছেন। কেবল সাওদা (رضي الله عنها) মোটা স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় ভিড় হওয়ার পুর্বে, ফজরের আগেই, কঙ্কর নিক্ষেপের অনুমতি নিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করেন। তবু তিনি নিজের কঙ্কর নিজেই মেরেছেন। তাই নারী হলেই প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে, তেমন কোনো কথা নেই। যখন ভীড় কম থাকে নারীরা তখন গিয়ে কঙ্কর মারবে। এবং নিজের কঙ্কর নিজেই মারবে, এটাই উত্তম তরিকা। হাঁ যদি ভীড় লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে প্রতিনিধির মাধ্যমে কঙ্কর নিক্ষেপ করালে সমস্যা হবে না। তবে বর্তমানে জামারাতের স্তম্ভ যেভাবে লম্বা করে দেয়া হয়েছে তাতে, সময়-ক্ষণ বুঝে, যে কেউ অনায়াসে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে।

দ্বিতীয় আমল : হাদী জবেহ করা

বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে হাদী জবেহ বিষয়ে মনোনিবেশ করুন। তামাত্তু ও কেরান হজ পালনকারীর জন্য হাদী জবেহ করা ওয়াজিব। ইফরাদ হজকারীর জন্য মুস্তাহাব। উট-গরু-বকরি-মেষ হাদী হিসেবে জবেহ করা যায়। উট হলে ৫ বছর বয়সের, গরু হলে দুই বছর বয়সের ও মেষ হলে এক বছর বয়সের হতে হবে। উট ও গরু হলে একটাতে সাতজন অংশ নিতে পারবেন। তবে কারো অংশই যেন একসপ্তমাংশের কম না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বকরি ও ভেড়ার ক্ষেত্রে এক হাদী একজনের জন্য জবেহ করতে হবে।

কোথায় পাবেন হাদী

মিনায় হাদী বিক্রির হাট বসে। মক্কায়ও কোথাও কোথাও বসে। তবে সাধারণ হাজির পক্ষে এসব হাটে গিয়ে হাদী ক্রয় করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই হাদী জবাই করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহের যে কোনো একটি অবলম্বন করুন।

এক. ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী জবেহ করার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে, হজের পূর্বে যে কোনো এক সুযোগে আল-রাজী ব্যাংক (بنك الراجحي) অথবা অন্য কোনো ব্যাংক, যেখানে হাদীর টাকা নেয়া হচ্ছে বলে শুনবেন, টাকা জমা করে রসিদ নিয়ে নেবেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, ১০ জিলহজ, সকাল দশটার পর হাদী জবাই শুরু করেন। সকাল ১০টা ১১টার দিকে আপনার হাদী জবাই হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে পারেন ও মাথা মুণ্ডন করতে পারেন। এটাই হল হাদী জবেহ করার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মাধ্যম। বিশেষ করে ব্যালটি হাজিদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশি উপযোগী। কেননা ব্যালটি হাজিদের কোরবানির পয়সা যার যার কাছে ফেরত দেয়া হয়। এই সুযোগে অনেক অসৎ লোক হাজিদের টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য নানা প্রলোভন দেখায়, ও হাদী জবেহ না করেই ফোনের মাধ্যমে জবেহ হয়ে গিয়েছে বলে খবর দিয়ে দেয়। তাই ব্যালটি হাজিদের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী জবেহ করাই হল সর্বোত্তম পন্থা।

দুই. নন ব্যালটি হাজিগণ বিভিন্ন কাফেলার আওতায় থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফেলার লিডাররা হাদী জবেহ করার দায়িত্ব নেন। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়ার জন্য করণীয় হল বিশ্বস্ত কয়েকজন যুবক-হাজি কাফেলার লিডারের সাথে দিয়ে দেয়া, যারা সরেজমিনে হাদী ক্রয় ও জবাই প্রক্রিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন ও সহযাত্রী অন্যান্য হাজিদেরকে এ মর্মে অবহিত করবেন। এরূপ না করে কেবল কাফেলা লিডারকে টাকা দিয়ে দেওয়া ও হাদী জবেহ হল কি-না ফোনের মাধ্যমে যেনে নেয়া উচিত হবে না।

তিন. মক্কায় কারও বিশ্বস্ত আত্মীয়-স্বজন কর্মরত থাকলে তাদের মাধ্যমেও হাদী জবেহ করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে যার মাধ্যমে হাদী জবেহ করানো হচ্ছে তার যথেষ্ট সময় আছে কি-না। কেননা হজ মৌসুমে মক্কায় অবস্থানকারীরা নানা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

অজানা ভুলের জন্য দম দেয়া

নিয়ম মোতাবেক হজের প্রত্যেকটি কর্ম সম্পাদনের পরও কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন যে কে জানে কোথাও কোনো ভুল হল কি-না। কাফেলা লিডারদের কেউ কেউ হাজি সাহেবদেরকে উৎসাহিত করেন যে ভুলত্রুটি হয়ে থাকতে পারে তাই একটা দমে-খাতা দিয়ে দিন, শত-ভাগ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার হজ। এরূপ করাটা মারাত্মক অন্যায়। কেননা আপনার হজ সহিহ-শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিজ ইচ্ছায় তাকে সন্দেহযুক্ত করছেন। আপনার যদি সত্যি সত্যি সন্দেহ হয় তাহলে একজন বিজ্ঞ আলেমকে আপনার হজের বিবরণ শুনান। তিনি যদি বলেন যে আপনার উপর দম ওয়াজিব হয়েছে তবেই কেবল দম দিয়ে শুধরিয়ে নেবেন। অন্যথায় নয়। শুধু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে দমে-খাতা দেওয়ার কোনো বিধান ইসলামে নেই। তাই যে যাই বলুক না কেন এ ধরনের কথায় আদৌ কর্ণপাত করবেন না। হাঁ, আপনি যদি নফল হাদী অথবা

কোরবানি জবেহ করতে চান তাহলে যত ইচ্ছা করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজের সময় হাদী ও কোরবানি মিলিয়ে একশত উট জবেহ করেছিলেন।[১]

হজের হাদী ব্যতীত অন্য কোনো কোরবানি করতে হবে কি- না?

বিজ্ঞ ওলামাগণ হজের হাদী উভয়টার জন্যই যথেষ্ট হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাজি যদি মুকিম হয়ে যায় এবং নেসাবের মালিক হয় তবে তার উপর ভিন্নভাবে কোরবানি করা ওয়াজিব বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে হাজি মুকিম না মুসাফির, এ নিয়েও একটা বিতর্ক আছে।

হাদী জবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন প্রসঙ্গ

ইচ্ছাকৃতভাবে হাদী জবেহ করার পূর্বে মাথা-মুণ্ডন করা নিয়ম-বহির্ভূত কাজ। তদ্রূপভাবে এদিনের অন্যান্য কাজেও তরতিবের উল্টো করা উচিত নয়। তবে যদি কেউ অপারগ হয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারে, অথবা ভুলবশত উলট-পালট করে বসে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে হজ করার সময় সাহাবায়ে কেরামদের কেউ কেউ এরূপ আগে-পিছে করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, 'কর, কোনো অসুবিধা নেই। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে—

كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح ، قال: إذبح ولا حرج وقال: رميت بعد ما أمسيت ، قال: لا حرج .

–মিনায়, কোরবানির দিন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হত। তিনি বলতেন, 'সমস্যা নেই'। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমি জবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন জবেহ কর, কোনো সমস্যা নেই। লোকটি বললেন, 'আমি সন্ধ্যার পর কঙ্কর মেরেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সমস্যা নেই।[২]

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে—

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة، فقال : يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي، فقال : ارم ولا حرج، وأتاه آخر، فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي، قال : ارم ولا حرج، وأتاه آخر، فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال : ارم ولا حرج، قال : فما رأيته سئل يومئذ عن شيء، إلا قال : افعلوا ولا حرج.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে শুনেছি– এক ব্যক্তি ১০ জিলহজ তাঁর কাছে এল। তিনি তখন জামরার কাছে দাঁড়ানো ছিলেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি, তিনি বললেন, নিক্ষেপ করো সমস্যা নেই। অন্য আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে জবেহ করেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ কর সমস্যা নেই। অন্য আরেক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ করো সমস্যা নেই। বর্ণনাকারী বললেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে যে প্রশ্নই করা হয়েছে তার উত্তরেই তিনি বলেছেন, করো সমস্যা নেই।[৩]

এ সম্পর্কে আরো হাদিস রয়েছে যেগুলো শুদ্ধ ও যেগুলোর আলোকে আমল করলে হজের আদৌ কোনো ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে ও কোরবানি আদায় প্রক্রিয়া জটিল, এমনকী কিছু কিছু ক্ষেত্রে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায়, বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে সরল আকারে দেখেছেন আমদেরও সেভাবে নেয়া উচিত। বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর প্রখ্যাত দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ—যাদেরকে সাহেবাইন বলা হয় ও ইমামের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কথার ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়—১০ জিলহজের কাজসমূহে তরতিব তথা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারলেও দম ওয়াজিব হবে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। হানাফি ফেকাহর প্রসিদ্ধ কিতাব, بدائع الصنائع -তে এসেছে: فإن حلق قبل الذبح من غير إحصار فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا شيء عليه –

যদি জবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে তবে এর জন্য দম দিতে হবে আবু হানিফা (র) মতানুযায়ী। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ ও আহলে ইলেমের একটি জামাতের মতানুযায়ী, কিছুই দিতে হবে না।[৪]

---

[১] - মুসলিম : হাদিস নং ৩৩১৮০

[২] - বোখারি : হাদিস নং ১৬২০

[৩] - মুসলিম : মুসলিম হাদিস নং '২৩০৫

[৪] - বাদায়েউস্‌সানায়ে' : খন্ড : ২, পৃ:১৫৮

তৃতীয় আমল: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

হাদী জবেহ হয়েছে বলে নিশ্চিত হলে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করুন। তবে মুণ্ডন করাই উত্তম। পবিত্র কুরআনে মুণ্ডন করার কথা আগে এসেছে, ছোট করার কথা পরে। এরশাদ হয়েছে, 'مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ – তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করবে ও কেউ কেউ চুল ছোট করবে।[১] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। হাদিসে এসেছে, আনাস (ﷺ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিনায় এলেন, জামরাতে এসে তিনি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি মিনায় তাঁর অবস্থানের জায়গায় এলেন ও কোরবানি করলেন। এরপর তিনি ক্ষৌরকারকে বললেন, নাও। তিনি হাত দিয়ে (মাথার) ডান দিকে ইশারা করলেন, অতঃপর বাম দিকে। এরপর মানুষদেরকে তা দিতে লাগলেন।[২] যারা মাথা মুণ্ডন করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন তিন বার। আর যারা চুল ছোট করে তাদের জন্যে দোয়া করেছেন এক বার।

মাথা মুণ্ডনের ফজিলত

হাদিসে এসেছে, 'আর তোমার মাথা মুণ্ডন কর, এতে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি ছোয়াব ও একটি গুনাহের ক্ষমা রয়েছে।[৩]

মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার পদ্ধতি

মাথা মুণ্ডন করা হোক বা চুল ছোট করা হোক সমস্ত মাথা ব্যাপ্ত করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সমস্ত মাথা ব্যাপ্ত করে মুণ্ডন করেছিলেন। মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা অথবা ছোট করা, আর কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া রাসূলুল্লাহর আদর্শের বিপরীত। হাদিসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। নাফে' ইবনে ওমর (ﷺ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাজা' قزع থেকে বারণ করেছেন। কাজা' কি? এ ব্যাপারে নাফে'কে জিজ্ঞাসার করা হলে তিনি বললেন, শিশুর মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা ও কিছু অংশ রেখে দেয়া।[৪]

কসর অর্থাৎ চুল ছোট করার অর্থ সমগ্র মাথা থেকে এক আঙুল পরিমাণ চুল কেটে ফেলা।[৫] কারো টাক মাথা থাকলে মাথায় ব্লেড অথবা ক্ষুর চালিয়ে দিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

নারীদের ক্ষেত্রে হাতের আঙুলের এক কড়া পরিমাণ চুল কেটে ফেললেই যথেষ্ট হবে। নারীদের জন্য হলক নেই।[৬] সমগ্র মাথার চুল একত্রে ধরে এক আঙুল পরিমাণ কাটতে হবে। এতটুকু কাটার নামই কসর।

মাথা মুণ্ডনের পর নখ কাটা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নখ কেটেছিলেন।[৭] ইবনে ওমর (ﷺ) হজ অথবা উমরার পর দাড়ি ও গোঁফও সামান্য কাটতেন।[৮] তবে দাঁড়ির ক্ষেত্রে এক মুষ্টির বেশি হলে ইবনে ওমর (ﷺ) এর মতো করা যেতে পারে, অন্যথায় নয়। বগল ও নাভির নীচ পরিষ্কার করাও বাঞ্ছনীয়। কেননা তা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ (وليَقْضُوا تَفَثَهُمْ – এবং তারা যেন তাদের ময়লা পরিষ্কার করে।) এর আওতায় পড়ে।

ক্ষৌর-কার্যের পর গোসল করে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করে সেলাই করা কাপড় পরবেন। সুগন্ধি ব্যবহার করবেন।[৯] এভাবে আপনি প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। এখন থেকে আপনি সেলাই করা কাপড় পরিধান, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি করতে পারবেন। তবে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন মিলন ইত্যাদি এখনও বৈধ হবে না। তাওয়াফে যিয়ারার পরই কেবল এসব সম্ভব হবে, যখন সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবেন।

চতুর্থ আমল: তাওয়াফে যিয়ারত

---

[১] - সূরা আল ফাতহ : ২৭

[২] - عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى ، فأتى الجمرة ، فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق : خذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس (মুসলিম :২২৯৮)

[৩] - وأما حلقك لرأسك فإن لك بكل شعرة حسنة وتسقط سيئة (মুসলিম : হাদিস নং ৩৪৮)

[৪] - نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ، فقيل لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا (মুসলিম : হাদিস নং ৩৯৫৯)

[৫] - সাইয়িদ সাবিক : ফেকহুস্‌সুন্নাহ , খন্ড: ১, পৃ: ৭৪৩ ; ইবনে মুনযের বলেছেন, যতটুকু কাটলে কসর (চুল ছোট করা) বলা হবে ততটুকু কাটলেই যথেষ্ট হবে)

[৬] - ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৯৮৫) অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'نهى المرأة أن تحلق رأسها – রাসলুল্লাহ (ﷺ) নারীকে মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন ।' তিরমিযী : ৩/২৫৭)

[৭] - সাইয়িদ সাবেক : ফেকহুস্‌সুন্নাহ , প্রাগুক্ত

[৮] - كان ابن عمر إذا حلق في حج او عمرة أخذ من لحيته وشاربه (বায়হাক্বী : হাদিস নং ৯১৮৬)

[৯] - আয়েশা (ﷺ) থেকে বর্ণীত এক হাদিসে এসেছে,' كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت – আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সুগন্ধযুক্ত করতাম তাঁর ইহরামের জন্য, ইহরাম বাঁধার পূর্বে, এবং তাঁর হালাল হওয়ার জন্য বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বে । (মুসলিম : হাদিস নং ২০৪২)

১০ জিলহজের চতুর্থ আমল হল তাওয়াফে যিয়ারত। তাওয়াফে যিয়ারত ১০ তারিখেই সেরে নেয়া ভালো। কঙ্কর নিক্ষেপ—হাদী জবেহ—ক্ষৌর কার্য এ-তিনটি আমল শেষ করে গোসল করে, সুগন্ধি মেখে সেলাইযুক্ত কাপড় পড়ে পবিত্র কাবার দিকে রওয়ানা হবেন। শুরুতে উমরা আদায়ের সময় যে নিয়মে তাওয়াফ করেছেন ঠিক সে নিয়মে তাওয়াফ করবেন। এ তাওয়াফটি হল হজের ফরজ তাওয়াফ। এ তাওয়াফে রামল ও ইযতিবা নেই। তাওয়াফের পর, উমরা অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে সাফা মারওয়ার সাঈ করবেন।

ইফরাদ হজকারী তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করে থাকলে এখন আর সাঈ করতে হবে না। কেরান হজকারীও পূর্বে সাঈ করে থাকলে এখন আর সাঈ করতে হবে না। তবে তামাত্তু হজকারীকে অবশ্যই সাঈ করতে হবে। কেননা তামাত্তু হজকারীর ইতোপূর্বে সাঈ করে নেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

জমহুর ফুকাহার নিকট ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করে নেয়া উত্তম। তবে এরপরেও করা যেতে পারে, এবং এর জন্য কোনো দম দিতে হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর অভিমতও এটাই। অর্থাৎ সাহেবাইনের নিকট তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের সময়সীমা উন্মুক্ত এবং বারো তারিখের পরে আদায় করলে কোনো দম দিতে হবে না।[১]

মাসিক স্রাব-গ্রস্ত মহিলার করণীয়

মাসিক স্রাব-গ্রস্ত মহিলাগণ অপেক্ষা করবেন। স্রাব বন্ধ হলে তাওয়াফে যিয়ারত সেরে নেবেন। এ ক্ষেত্রে কোনো দম দিতে হবে না। আর যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে স্রাব বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত কোনো ক্রমেই অপেক্ষা করা যাচ্ছে না, ও পরবর্তীতে এসে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে নেয়ারও কোনো সুযোগ নেই, তাহলে ন্যাপকিন দিয়ে ভাল করে বেঁধে তাওয়াফ যিয়ারত সেরে নেওয়া বৈধ রয়েছে।

সাঈ অগ্রিম করে নেয়া প্রসঙ্গে

১০ জিলহজ তাওয়াফে যিয়ারতের পর যে সাঈ করতে হয় তা ১০ তারিখের পূর্বে আদায় করে নেওয়া খেলাফে সুন্নত। তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করে নিলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করতে হয় না, সেটি অন্য ব্যাপার, এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তবে যদি কেউ ১০ তারিখে তাওয়াফ করার পূর্বে সাঈ করে নেয় তবে তা শুদ্ধ হবে। হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, سعيت قبل أن أطوف –আমি তাওয়াফ করার পূর্বে সাঈ করে ফেলেছি' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তরে বললেন, 'করো, সমস্যা নেই'[২] তবে হাদিসের ভাষ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, লোকটি ১০ জিলহজ তারিখে অগ্রিম সাঈ করেছিলেন। সে হিসেবে তামাত্তু হজকারী যদি ১০ জিলহজের পূর্বে অগ্রিম সাঈ করে নেয় তা হলে সাঈ হয়ে যাবে বলে হাদিস অথবা সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে কোনো প্রমাণ নেই। হানাফি ফেকাহর প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়িউস্‌সানায়ে'তে এ ভাবে সাঈ করার বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। উক্ত কিতাব থেকে এখানে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি:

إذا أحرم المتمتع بالحج فلا يطوف بالبيت و لا يسعى في قول أبي حنيفة و محمد . لأن طواف القدوم للحج لمن قدم مكة بإحرام الحج ، والمتمتع إنما قدم مكة بإحرام العمرة، لا بإحرام الحج . وإنما يحرم للحج من مكة، وطواف القدوم لا يكون بدون القدوم، وكذلك لا يطوف و لا يسعى أيضا لأن السعى بدون الطواف غير مشروع. ولأن المحل الأصلى للسعي ما بعد طواف الزيارة، لأن السعي واجب، وطواف الزيارة فرض. والواجب يصلح تبعا للفرض. فأما طواف القدوم فسنة، والواجب لا يتبع السنة. إلا أنه رخص تقديمه على محله الأصلى عقيب طواف القدوم، فصار واجبا عقيبه بطريق الرخصة. وإذا لم يوجد طواف القدوم يؤخر السعى إلى محله الأصلى ، فلا يجوز قبل طواف الزيارة

অর্থাৎ 'তামাত্তু হজকারী ব্যক্তি যখন হজের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধবে তখন সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। সাঈও করবে না। এটা হল ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর অভিমত। কারণ তাওয়াফে কুদুম ওই ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত যে হজের এহরাম নিয়ে মক্কায় আগমন করল। পক্ষান্তরে তামাত্তু হজকারী উমরার এহরাম নিয়ে মক্কায় আগমন করেছে। হজের এহরাম নিয়ে আগমন করেনি। তামাত্তু হজকারী ব্যক্তি মক্কা থেকেই হজের এহরাম বাঁধে। আর তাওয়াফে কুদুম বাহির থেকে আগমন ব্যতীত হয় না। তাওয়াফ-সাঈ এ জন্যেও করবে না যে, তাওয়াফ ব্যতীত সাঈ করা শরিয়তসম্মত নয়। কেননা সাঈর মূল জায়গা তাওয়াফে যিয়ারার পর। কেননা সাঈ হল ওয়াজিব। আর তাওয়াফে যিয়ারা হল ফরজ। ওয়াজিব, ফরজের তাবে' বা অনুবর্তী হতে পারে। পক্ষান্তরে তাওয়াফে কুদুম সুন্নত। এবং ওয়াজিব সুন্নতের তাবে' বা অনুবর্তী হতে পারে না। তবে তাওয়াফে কুদুমের ক্ষেত্রে সাঈকে তার মূল জায়গা হতে এগিয়ে নিয়ে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই

---

[১] - و في قول أبي يوسف و محمد غير مؤقت أصلا ، و لو أخره عن أيام النحر لا شيء عليه (আলা কাসানী : বাদায়িউস্‌সানায়ে' : খন্ড ২ , পৃ : ৩১৪)

[২] - আবু দাউদ : হাদিস নং ১৭২৩

অনুমতির কারণে তাওয়াফে কুদুমের পর 'ওয়াজিব' আদায়যোগ্য হয়েছে। তাই তাওয়াফে কুদুমের অনুপস্থিতে সাঈকে তার মূল জায়গায় পিছিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে আদায় করা জায়েয হবে না।[১]

উক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে আমাদের বাংলাদেশি হাজিগণ ৮ তারিখ মিনায় যাওয়ার সময় এহরাম বেঁধে, নফল তাওয়াফ করে, যে ভাবে সাঈ সেরে নেন তা আদৌ উচিত নয়। কেননা এর পেছনে আদৌ কোনো যুক্তি নেই।

কেউ কেউ বলেন যে সাঈ এহরাম অবস্থায় করা মুস্তাহাব। আর এ মুস্তাহাব বাস্তবায়নের একটাই সুরত। আর তাহলো ৮ তারিখ এহরাম বেঁধে নফল তাওয়াফ করে সাঈ করে নেয়া। এ কথার পেছনে আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। কেননা তামাত্তুকারী সাহাবিগণ এহরাম বিহীন সাঈ করেছিলেন। মুস্তাহাব হলে নিশ্চয়ই তারা এরূপ করতেন না।

মিনায় রাত্রিযাপন

তাওয়াফ-সাঈ শেষ করে মিনায় ফিরে আসতে হবে। ১০ তারিখ দিবাগত রাত ও ১১ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন করতে হবে। ১২ তারিখ যদি মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে যায় তাহলে ১২ তারিখ দিবাগত রাতও মিনায় যাপন করতে হবে। ১৩ তারিখ কঙ্কর মেরে তারপর মিনা ত্যাগ করতে হবে।

মিনায় রাত্রিযাপন গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যোহরের সালাত মসজিদুল হারামে আদায় ও তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করে মিনায় ফিরে এসেছেন ও তাশরীকের রাতগুলো মিনায় কাটিয়েছেন।[২] ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ওমর (রা.) আকাবার ওপারে (মিনার বাইরে) রাত্রিযাপন করা থেকে নিষেধ করতেন। এবং তিনি মানুষদেরকে মিনায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দিতেন।[৩] মিনায় কেউ রাত্রিযাপন না করলে ওমর শাস্তি দিতেন বলেও এক বর্ণনায় এসেছে।[৪] ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন মিনার কোনো রাত, আইয়ামে তাশরীকে, আকাবার ওপারে যাপন না করে।[৫] এলাউস্‌সুনান কিতাবে রয়েছে,

ودلالة الأثر على لزوم المبيت بمنى في لياليها ظاهرة ، وقد تقدم أن ظاهر لفظ الهداية يشعر بوجوبها عندنا.

–মিনায় রাত্রিযাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে হাদিসের ভাষ্য স্পষ্ট। আর এটা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে হেদায়ার শব্দমালা মিনায় রাত্রিযাপন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অনুভূতি দিচ্ছে।[৬] সে হিসেবে হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য মতামত হল, আইয়ামে তাশরীকে মিনার বাইরে অবস্থান করা মাকরূহে তাহরীমি (ترك المقام بها مكروه تحريما)[৭] তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মিনায় অবস্থায় করুন। দিনের বেলায়েও মিনাতেই থাকুন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোও মিনায় কাটিয়েছেন।

১১, ১২, ও ১৩ জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ

কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। কঙ্কর নিক্ষেপের দিন চারটি। ১০, ১১,১২, ১৩ জিলহজ। ১০ জিলহজ কেবল বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয় যা ইতোপূর্বে সেরে নিয়েছেন। অন্যান্য দিন (১১,১২,১৩ তারিখ) তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। এ দিনগুলোয় কঙ্কর নিক্ষেপের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় দুপুরে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে, চলতে থাকে দিবাগত রাতে সুবেহ সাদেক উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত।

১১ জিলহজ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথমে ছোট জামরায় ৭ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন।[৮] কাবা শরীফ বাম দিকে ও মিনা ডান দিকে রেখে দাঁড়াবেন। খুশুখুজুর সাথে আল্লাহর শিআর –নিদর্শনের– যথাযথ তাজিম বুকে নিয়ে একটি একটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। 'আল্লাহ আকবার' বলে প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। ছোট জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ হলে একটু সামনের এগিয়ে যাবেন। কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন ও হাত উঠিয়ে দীর্ঘ মোনাজাত করবেন। এরপর মধ্য জামরায় যাবেন। এখানেও ৭টি কঙ্কর একই কায়দায় নিক্ষেপ করবেন। নিক্ষেপের পর সামান্য এগিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আবারও দীর্ঘ মোনাজাত করবেন। এরপর বড় জামরায় কঙ্কর মারতে যাবেন। নিয়ম মতো এখানেও

---

[১] - আল কাসানী : বাদায়িউস্‌সানায়ে': খন্ড ২, পৃ: ৩৪৭

[২] -عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق (আবু দাউদ: ১৬৮৩)

[৩] - عن ابن عمر : أن عمر رضي الله عنه كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يدخلوا منى (ইবনু আবি শায়বা: ১৪৩৬৮)

[৪] - এলাউস্‌সুনান : খন্ড : ৭ , পৃ: ৩১৯৫

[৫] - عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه قال : لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق (ইবনু আবি শায়বা : ১৪৩৬৭)

[৬] - এলাউস্‌সুনান : খন্ড : ৭, পৃ: ৩১৯৫

[৭] - প্রাগুক্ত

[৮] - যা মসজিদে খায়েফের নিকটে ও মিনার দিক থেকে পদব্রজিদের রাস্তা হয়ে এলে, প্রথমে অবস্থিত। এ জামরাকে ' জামরাতুস্‌সুগরা' বলেও ডাকা হয়।

৭টি কঙ্কর মারবেন, তবে এবার আর দোয়া করতে হবে না, কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে দাঁড়ান নি।[১] কঙ্কর মারা শেষ হলে তাঁবুতে ফিরে আসবেন।

১২ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ

১২ জিলহজ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় শুরু হয়। চলতে থাকে দিবাগত রাতে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত। ১১ তারিখের মত ১২ তারিখেও তিন জামরাতে, একই নিয়মে, কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। জামরাতুল উলা ও জামরাতুল উস্‌তায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর কেবলামুখী হয়ে যথা সম্ভব দীর্ঘক্ষণ দোয়া করবেন। শেষ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করার বিধান নেই। তবে যদি ১২ তারিখেই কঙ্কর মারা শেষ করতে চান তবে বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর মনে মনে অথবা মুখে উচ্চারণ করে বলতে পারেন, 'হে আল্লাহ এই হজকে হজে মাবরুর বানাও, ও গুনাহ ক্ষমা করে দাও'

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا[২]

১২ তারিখ কঙ্কর মারার প্রথম ওয়াক্তে প্রচণ্ড ভিড় থাকে। তাই একটু দেরি করে বিকালের দিকে যাবেন। ১২ তারিখেই কঙ্কর-নিক্ষেপ পর্ব শেষ করা যায়। তবে ১২ তারিখ দিবাগত রাতে মিনায় থেকে গিয়ে ১৩ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারলে ভালো। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১৩ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

' فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى

–যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোনো পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোনো পাপ নেই, এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে।[৩]

কোনো কোনো হজ কাফেলার নেতাদেরকে দেখা যায় যে তারা ১১ তারিখ মধ্য রাতের পর হাজি সাহেবদেরকে নিয়ে মিনা ত্যাগ করে চলে যান। রাতের বাকি অংশ মক্কায় যাপন করে পরদিন যোহরের পর মক্কা থেকে এসে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন ও আবার মক্কায় চলে যান। এরূপ করাটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আদর্শের বিপরীত। বিশেষ অসুবিধায় না পড়লে এরূপ করা উচিত নয়। আর মিনায় রাত ও দিন উভয়টাই যাপন করা উচিত। কেননা মিনায় রাত্রিযাপন যদি ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে থাকে তাহলে দিন যাপন সুন্নত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দিন ও রাত উভয়টাই মিনায় যাপন করেছেন।

১৩ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ

১২ জিলহজ মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে গেলে মিনাতেই রাত কাটাতে হবে এবং ১৩ তারিখ সূর্য ঢলে গেলে তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করতে হবে। তবে যদি কেউ ১২ তারিখ সূর্যাস্তের যথেষ্ট সময় পূর্বে তাঁবু থেকে মিনা ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, এবং অনিচ্ছাকৃত কোনো সমস্যার কারণে—যেমন বৃষ্টি-যানজট ইত্যাদি—মিনা থেকে বের হওয়ার আগেই সূর্য অস্ত যায় তাহলে মিনায় রাতযাপন করতে হবে না।

মক্কায় ফিরে যাওয়া

কঙ্কর নিক্ষেপ-পর্ব শেষ করে মক্কায় ফিরে যাবেন। দেশে ফেরা অথবা মদিনা গমনের আগ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবেন। এ সময় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় ও দোয়া জিকিরে মশগুল থাকবেন। এ সুযোগে দেশে নিয়ে আসার জন্য যমযমের পানি সংগ্রহ করে নেওয়া যায়। স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য সাধ্য-মত হাদিয়া-তোহফা যেমন জায়নামাজ, বোরকা, কুরআন তিলাওয়াতের ক্যাসেট ইত্যাদি ক্রয় করতে পারেন।

বিদায়ি তাওয়াফ

মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ি তাওয়াফ (طواف الوداع) আদায় করে নেবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায়ি তাওয়াফ আদায় করেছেন ও বলেছেন, বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ না করে তোমাদের কেউ যেন না যায়।[১] অন্য এক বর্ণনা অনুসারে,

---

[১] - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف – ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণীত : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে শেষ করতেন, তখন তিনি চলে যেতেন, দাঁড়াতেন না। (ইবনে মাযাহ)

[২] - ইবনে ওমর জামরাতুল আকাবায় কংকর মেরে শেষ করে এই দোয়া পড়তেন: حتى إذا فرغ قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا (ইবনু আবি শায়বা: ১৪০১৬)

[৩] - সূরা আল বাকারা : ২০৩

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) কে বললেন, লোকদেরকে বলো, তাদের শেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, তবে তিনি মাসিক স্রাব-গ্রস্ত নারীর জন্য ছাড় দিয়েছেন।[২]

বিদায়ি তাওয়াফের নিয়ম

তাওয়াফের নিয়ত করে হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফের নিয়মে বায়তুল্লাহ্ সাত বার প্রদক্ষিণ করবেন। তাওয়াফ শেষে ইচ্ছে হলে মুলতাযামে চেহারা, বুক ও দুই বাহু ও দুই হাত রেখে আল্লাহর কাছে যা খুশি চাইতে পারেন। এরপর দু'রাকাত তাওয়াফের সালাত আদায় করবেন। সালাত শেষে যমযমের পানি পান করবেন। পান করার সময় আপনার যা খুশি আল্লাহর কাছে সওয়াল করবেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফ থেকে বের হওয়ার সময় পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হতে হবে বলে যে একটি কথা আছে, তা নিতান্তই কুসংস্কার। এরূপ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন।

হজের ভুলত্রুটির ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ

হজের ভুলত্রুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক. এহরামের বিধিনিষেধ বিষয়ক ভুল। দুই. হজের কার্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে ভুল।

এহরামের বিধিনিষেধ বিষয়ক ভুলের ক্ষেত্রে কী করণীয় তা ওপরে উল্লেখ হয়েছে।

হজকর্মসমূহে কয়েক প্রকার ভুল হতে পারে।

ক. হজের কোনো ফরজ ছুটে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিয়ে কাজ হবে না। বরং গোটা হজই পুনরায় আদায় করতে হবে যেমন, কারও যদি উকুফে আরাফা ছুটে যায় তাহলে পরবর্তীতে আবার হজ করা ব্যতীত এর ক্ষতিপূরণ হবে না।

খ. হজের কোনো ওয়াজিব সম্পূর্ণ ছুটে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে দম জবেহ করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেমন কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। বিনা ওজরে যদি কেউ কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয়, তবে দম জবেহ করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হজের কোনো ওয়াজিব আংশিক ছুটে গেলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট সদকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিলে হয়ে যাবে।

গ.হজের কোনো সুন্নত-মুস্তাহাব ছুটে গেলে দম জবেহ করে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে অবজ্ঞা অবহেলা করে কোনো সুন্নত তরক করা উচিত নয়। যে কোনো প্রকার ভুল হলেই দম জবেহ করতে হবে, কথা এমন নয়।

---

[১] - لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (মুসলিম : হাদিস নং ২৩৫০)

[২] - أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (মুসলিম : হাদিস নং ২৩৫১)

যিয়ারতে মদিনা

মক্কার ন্যায় মদিনাও পবিত্র নগরী। মদিনার পবিত্রতা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং ঘোষণা করেছেন। হাদিসে এসেছে, 'হে আল্লাহ! ইব্রাহীম মক্কাকে পবিত্র হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, আর আমি এই দুই পাহাড়ের মাঝখানের জায়গা (মদিনা) পবিত্র বলে ঘোষণা করছি।' [১] মদিনা ইসলামের আশ্রয়ের স্থল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাদের হিজরতের জায়গা। রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ ও কোরবানির ইতিহাস মিশে আছে মদিনার ধুলো-কণায়। পবিত্র কুরআনের অর্ধেক নাযিল হয়েছে মদিনায়। অধিকাংশ হাদিসের উৎসও মাদানি জীবনের নানা ঘটনা-অনুঘটনা। সে হিসেবে যিয়ারতে মদিনা ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। মজবুত করতে পারে আমাদের বিশ্বাসের ভিত। আর হজের সফর যেহেতু মদিনায় যাওয়ার একটা বিরাট সুযোগ এনে দেয়– বিশেষ করে যারা বহির্বিশ্ব থেকে আসে তাদের জন্য– তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করাটাই বাঞ্ছনীয়। তবে যিয়ারতে মদিনা যাতে সুন্নত তরিকায় হয় এবং কোনো ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুমোদন ও ইজাযতের বাইরে না যায় সে বিষয়টি ভালোভাবে নজরে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নটি আসবে মদিনা গমনের উদ্দেশ্য নিয়ে।

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা যাবে না, এ মর্মে হাদিসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বুখারি ও মুসলিম শরীফে এসেছে,

لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، مسجدي هذا والمسجد الأقصى

–তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করো না। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববি) ও মসজিদুল আকসা।[২] প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.) উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, জাহেলি যুগের মানুষেরা তাদের নিজস্ব ধারণা মতে বিশেষ-বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে গিয়ে নানা রকম প্রথা চালু করেছিল। তারা সে সব স্থানের জিয়ারতকে পুণ্যের কাজ মনে করত। মুসলমানরা যাতে উক্ত জাহেলি প্রথার অনুকরণ না করে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবল তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ করে দিয়েছেন।[৩] শুধু তাই নয় বরং কবর কেন্দ্রিক সকল উরস-উৎসব কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এবং আমার কবরকে তোমরা উৎসবে পরিণত করো না।'[৪] উৎসবে পরিণত করার অর্থ, কবর-কেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যার মধ্যে কবরকে উদ্দেশ্য করে সফর করাও শামিল।

'তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো জায়গার উদ্দেশ্যে সফর করো না' এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে অধিকাংশ মুহাক্কিক ওলামাগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় সফর করাকে অবৈধ বলেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, আবু মুহাম্মদ আল জনী, কাজী আয়াজ কাজী হুসাইন প্রমুখ। ফতোয়ায়ে রশীদিয়াতেও একই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।[৫] সে হিসেবে মদিনা গমনের উদ্দেশ্য, কবর যিয়ারত হলে, তা শুদ্ধ হবে না। নিয়ত করতে হবে মসজিদে নববি যিয়ারতের। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে নববিতে সালাত আদায় বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। এক হাদিসে এসেছে, 'আমার এই মসজিদে সালাত অন্য মসজিদে এক হাজার সালাত থেকেও উত্তম। তবে মসজিদুল হারাম ব্যতীত।[৬] অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'আমার এই মসজিদে সালাত অন্য মসজিদে এক হাজার সালাত থেকে উত্তম। তবে মসজিদুল হারাম ব্যতীত। আর মসজিদুল হারামে সালাত অন্য মসজিদে এক লক্ষ সালাতের চেয়েও উত্তম।[৭] শুধু এতটুকই নয় বরং মসজিদে নববির একটি অংশ জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান বলে ব্যক্ত করেছেন। বুখারি শরীফে এসেছে, 'আমার ঘর ও মেম্বারের মাঝখানের জায়গা

---

[১] - عن أنس بن مالك رضي اللهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها (বোখারি : হাদিস নং ৩১১৬)

[২] -হাদিসটি বোখারি ও মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণীত ।

[৩] - শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি : হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা।

[৪] - ولا تجعلوا قبري عيدا (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৭৪৬)

[৫] - দ্রঃ ফতোয়ায়ে রশিদীয়া : খ: ৩, পৃ: ৩৩

[৬] - صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد ، إلا المسجد الحرام (মুসলিম: ২৪৭০)

[৭] - صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه (ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ১৩৯৬)

জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।[১] আর আমার মিম্বারটি আমার হাউজের ওপর।'[২] সে হিসেবে মসজিদে নববি যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় সফর করার নিয়ত করাটাই শরিয়ত-সিদ্ধ।

মদিনার পথে রওয়ানা

মসজিদে নববি যিয়ারতের নিয়ত করে আপনি মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। মদিনায় প্রবেশের সময় মদিনায় ইসলামের যে ইতিহাস বনেছে তা স্মরণ করবেন। মক্কার মতো মদিনাও পবিত্র। তাই মদিনায় গিয়ে যাতে আপনার দ্বারা কোনো বেয়াদবি না হয়, কোনো গুনাহ-পাপে লিপ্ত না হন, সে জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।

মদিনায় আপনার হোটেল বা বাসায় গিয়ে মালপত্র রেখে সামান্য বিশ্রাম করে নিন। এরপর মসজিদে নববিতে চলে যান। মসজিদে নববিতে যাওয়ার জন্য কোনো এহরাম তালবিয়া নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওপর দরুদ ও সালাত পড়ে-পড়ে যেতে হবে এ ব্যাপারেও কোনো হাদিস নেই। মদিনার গাছপালার ওপর নজর-পড়া-মাত্র অথবা সবুজ গম্বুজের ওপর দৃষ্টি-পড়া-মাত্র সালাত ও সালাম পড়তে হবে এ মর্মেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো আদর্শ নেই। যারা এরূপ করতে বলেছেন তারা একান্তই আবেগতাড়িত হয়ে বলেছেন। উপযুক্ত দলিল ব্যতীত আবেগের যথেচ্ছ প্রয়োগের কারণেই ইসলামি শরিয়ত স্বচ্ছতা হারিয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই।

মসজিদে নববিতে প্রবেশ

যে কোনো দরজা দিয়ে মসজিদে নববিতে প্রবেশ করতে পারেন। প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিন। আল্লাহর নাম স্মরণ করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি দরুদ পাঠ করুন। আল্লাহ যেন আপনার জন্য তাঁর রহমতের সমস্ত দরজা খুলে দেন সে জন্য দোয়া করুন। বলুন –

بِسْمِ اللهِ، والصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.[৩]

মসজিদে প্রবেশের পর, বসার পূর্বে, তাহিয়াতুল মাসজিদের দু' রাকাত সালাত আদায় করুন। হাদিসে এসেছে,

' إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلى ركعتين

–তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন দু'রাকাত সালাত আদায়ের পূর্বে না বসে'[4]। রাওজাতুল জান্নাতে—মসজিদের মেহরাবের কাছে সাদা ও সবুজ কার্পেট বিছানো জায়গা—আদায় করতে পারলে ভালো। কেননা রওজা শরীফ পবিত্রতম একটি জায়গা, জান্নাতের বাগান হিসেবে হাদিসে যার পরিচয় এসেছে। রওজায় জায়গা না পেলে যে কোনো স্থানে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করুন।[৫] এরপর লাইন ধরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র কবরের দিকে এগিয়ে যান।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর দুই সাথির কবর যিয়ারতের আদব

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র কবরের সামনে এলে আদবের সাথে দাঁড়ান। দাঁড়ানোর সুযোগ না পেলে চলমান অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি সালাম পেশ করুন, বলুন—'السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ'—আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক হে আল্লাহর নবী', রাসূলুল্লাহর গুণাবলির সাথে সংগতিপূর্ণ আরো কিছু শব্দ বাড়িয়ে দেয়া যাবে। বলা যাবে—

---

[১] - বেহেশতের বাগান বলতে কি বুঝায় এর ব্যাখ্যায় কেউ-কেউ বলেছেন যে এখানে আমল করলে বেহেশতের হকদার হওয়া যায়। ইমাম মালেক (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এ-জায়গাটুকু পরকালে বেহেশতে স্থাপন করা হবে, অথবা এ জায়গাটুকু বর্তমান অবস্থাতেই বেহেশতের একটি বাগান। (ইমাম নববী : কিতাবুল ইযাহ ফি মানাসিকিল হাজ্জি ওয়াল উমরা : পৃ: ৪৫৫)

[২] - ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي (বোখারি : হাদিস নং ১১২০)

[৩] - ইবনু মাজাহ : হাদিস নং (৭৭১) আলবানী এ হাদিসটি বিশুদ্ধ বলেছেন (দ্রঃ সহিহু সুনানি ইবনি মাজাহ ১/১২৮)

[৪] - বোখারি : হাদিস নং (৪৪৪) মুসলিম : হাদিস নং (১৬৫৪), হাদিসটির বর্ণনাকারী হলেন, আবু কাতাদা আস্‌সুলামি । মুসলিম শরীফের আরো একটি হাদিসে এসেছে, ' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه – দিনের বেলা নাস্তার সময় ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো সফর থেকে ফিরতেন না। তিনি ফিরে এলে মসজিদ দিয়ে শুরু করতেন। সেখানে তিনি দু' রাকাত সালাত আদায় করতেন, অতঃপর বসতেন। (মুসলিমঃ হাদিস নং ১৬৫৯)

[৫] - রাওজাতুল জান্নাতে সালাত আদায় করার জন্য ঝগড়া বা হৈচৈ করা মসজিদে নববীর আদব পরিপন্থী গোনাহের কাজ। ওমর (رضي الله عنه), মসজিদে নববীতে আওয়াজ উঁচু করতে দেখে তায়েফবাসী দুই ব্যক্তিকে বলেন, 'তোমরা মদিনাবাসী হলে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মসজিদে উঁচ্চ স্বরে কথা বলছ!) (বোখারি)। পবিত্র কোরআনে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আওয়াজের ওপর মুমিনরা যেন তাঁদের আওয়াজ উঁচু না করে, সেমর্মে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। (দ্রঃ সুরাতুল হুজরাত:২২) উক্ত নির্দেশের আলোকে ক্বারী আবুবকর ইবনুল আরাবী বলেন যে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) আদব প্রদর্শন তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কবরের সামনে বেশি উচ্চ স্মরে সালাম কালাম করা আদবের খেলাফ। (তাফসিরে মায়ারিফুল কোরআন)

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ الله ، وَأَمِيْنَــهُ عَلَى وَحْيِهِ ، وَخَيْرَتَه مِنْ خَلْقِه ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ ، وَأَدَّيْتَ الأَمَانَــــةَ ، وَنَصَحْتَ الأُمَّـــــــةَ ، وَجَاهَدْتَ فِيْ الله حَقَّ جِهَادِه .

–আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আল্লাহর বন্ধু! তাঁর ওহির বিশ্বস্ত পাত্র, ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি সাক্ষী দিচ্ছি, আপনি নিশ্চয়ই রেসালত পোঁছিয়ে দিয়েছেন। আমানত আদায় করেছেন। উম্মতকে নসিহত করেছেন। ও জিহাদ করেছেন আল্লাহর বিষয়ে সত্যিকারের জিহাদ)।

২. এরপর সামনের দিকে এক গজ পরিমাণ এগিয়ে যান। এখানে আবুবকর সিদ্দীক (রা.) এর প্রতি সালাম পেশ করুন। বলুন—

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ الله فِيْ أُمَّتِه ، رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا.

–আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আবু বকর, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে রাসূলুল্লাহর খলিফা তাঁর উম্মতের ভেতর। আল্লাহ আপনার ওপর রাজি হোন। উম্মতে মুহাম্মদির পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

৩. এরপর আরেক গজ সামনে আগান। এখানে ওমর (রা.) এর প্রতি সালাম পেশ করুন। বলুন—

ا لسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَ جَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا .

–আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে ওমর, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আমিরুল মুমিনিন। আল্লাহ আপনার ওপর রাজি হোন। উম্মতে মুহাম্মদির পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

এরপর বাইরে চলে আসুন। কেবলামুখী হয়ে বা কবরের দিকে মুখ করে দোয়া করবেন না। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, 'কবরের কাছে দোয়া করতে দাঁড়ানো আমি শুদ্ধ মনে করি না। তবে সালাম দেবে, ও চলে যাবে যেমনটি করতেন ইবনে ওমর (রা.)। ইমাম ইবনুল জাওযি বলেন, 'দোয়া করতে কবরে যাওয়া মাকরুহ। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ একই মন্তব্য ব্যক্ত করে বলেন, 'দোয়ার উদ্দেশ্যে কবরে যাওয়া মাকরুহ। দোয়ার জন্য কবরের কাছে দাঁড়ানোও মাকরুহ।'[১] তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাথীদ্বয়ের (রা.) কবরের কাছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো ও নিজের জন্য দোয়া করা উচিত নয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউই কবরের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের জন্য দোয়া করতেন বলে ইতিহাসে নেই। সাহাবাগণ, বরং, মসজিদে নববির যে কোনো জায়গায় দোয়া করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হুজরা মুবারকের কাছে এসেও তাঁরা দোয়া করতেন না।

ইমাম মালেক (রহ.) মদিনাবাসীদের জন্য, যতবার মসজিদে প্রবেশ করবে ততবার, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কবরে আসা ভালো মনে করতেন না। কেননা সালাফে-সালেহীনদের কেউই এরূপ করতেন না। তাঁরা বরং মসজিদে নববিতে আসতেন। আবুবকর, ওমর, উসমান ও আলী (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর পেছনে সালাত আদায় করতেন। সালাতের মধ্যেই রাসূলুল্লাহর প্রতি সালাম পেশ করতেন। বলতেন, السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ সালাত শেষে হয়তো বসতেন অথবা বের হয়ে চলে যেতেন। সালাম পেশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কবরে আসতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে সালাতের মধ্যে যে দরুদ ও সালাম পেশ করা হল তা অধিক উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ।[২]

সাহাবাগণ যখন নিজের অভাব অনটনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চাইতেন, কেবলামুখী হয়ে মসজিদের ভেতর দোয়া করতেন। যেমনটি করতেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবিত থাকা কালে। দোয়া করার জন্য হুজরা মুবারকের কাছে যেতেন না, কবরেও প্রবেশ করতেন না। সাহাবাগণ দূরদূরান্ত থেকে খুলাফায়ে রাশেদিনদের সাথে দেখা করতে এলে মসজিদে নববিতে সালাত আদায় করতেন। সালাতের ভেতর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করতেন। মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ বের হওয়ার সময়ও সালাত ও সালাম পেশ করতেন, বলতেন,

بِسْمِ الله، والصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ الله .

কবরের কাছে এসে সাধারণত সালাম পেশ করতেন না। কেননা এরূপ করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ করেননি। হাঁ, ইবনে উমর (রা.) সফর থেকে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাথি-দ্বয়ের কবরে এসে সালাম পেশ করতেন। তবে অন্যান্য সাহাবা এরূপ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র কবর যিয়ারতের সময় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র কবর হুজরা শরীফের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই কবরের দেয়াল ছুঁয়ে বরকত নেয়ার জজবা অনেকের মধ্যে থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। আসলে এ ধরনের জজবা-বাসনা থাকাই উচিত না। কেননা কবরের চার পাশে তাওয়াফ, কবর ছুঁয়ে বরকত নেয়া ইত্যাদি শরিয়তে অনুমোদিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কঠিনভাবে নিষেধ

---

[১] - দেখুন : ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ :২৪/৩৫৮ এবং ২৭/১৬-১৭

[২] - আল ফাতাওয়া : ২৭/৩৮৬

করেছেন যে তাঁর কবরকে যেন পূজ্য মূর্তিতে রূপান্তরিত করা না হয়।[১] আর স্পর্শ ও চুম্বন করার বিধান তো কেবল হাজরে আসওয়াদের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কাবার রুকনে য়ামেনিও স্পর্শ করার বিধান রয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো জায়গা, এমনকী পবিত্র কাবার অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করে বরকত নেয়ারও বিধান নেই। মুআবিয়া (ﷺ) একদা হজ করার সময় রুকনে শামি ও রুকনে গারবি অর্থাৎ কাবা শরীফের উত্তর পাশের দুই কোণ স্পর্শ করলেন। ইবনে আব্বাস (ﷺ) বিরোধিতা করলেন। এরূপ করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বিধানে নেই, স্পষ্ট করে তিনি মুআবিয়া (ﷺ) কে বুঝিয়ে দিলেন। মুআবিয়া খলিফা থাকা সত্ত্বেও ইবনে আব্বাস (ﷺ) এর কথা মেনে নিলেন। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামেনি ব্যতীত যদি পবিত্র কাবার অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করা শরিয়ত বহির্ভূত কাজ হয়ে থাকে তবে অন্য কোনো জায়গা ছুঁয়ে বরকত নিতে যাওয়া যে বড়ো বেদআত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই কবরে ঘর্ষণ মর্দন, গণ্ডদেশ ও বক্ষ লাগিয়ে বরকত নেয়ার ইচ্ছা করা হকপন্থী সকল মুসলমানদের কাছে অবৈধ। বরং এটা একপ্রকার শিরক।[২] পবিত্র কাবার অনুমোদিত অংশ ব্যতীত অন্য কোনো অংশ মাসেহ করা, ছোঁয়া যদি পুণ্যের কাজ না হয়ে থাকে তাহলে হুজরার দরজা জানালা স্পর্শ করে কী কোনো পুণ্যের আশা করা যেতে পারে?। হুজরার দেয়াল ও দরজা-জানালা তো নির্মিত হয়েছে বহু পরে। রাসূলের মহব্বত কবরের দরজা-জানালা স্পর্শ করে নয় বরং যথার্থভাবে রাসূলের আনুগত্য-ইত্তেবার মাধ্যমেই প্রকাশ করতে হয় রাসূলুল্লাহর মহব্বত ও তাজিম।

বিপদমুক্তি অথবা কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে প্রার্থনা করা যাবে না। বলা যাবে না যে হে আল্লাহর রাসূল আমাকে অমুক বিপদ থেকে মুক্ত করুন। অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করুন। কেননা এজাতীয় কাজ করা শিরক। এজাতীয় দোয়া কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খেতাব করেই করতে হয়। এরশাদ হয়েছে—

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

–এবং তোমাদের প্রতিপালক বললেন, আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতের প্রতি দম্ভ প্রদর্শন করে তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে, অপদস্ত হয়ে।[৩] অন্য এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে, ' قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ –বলুন আমি আমার নিজের কোনো অকল্যাণের বা কল্যাণের মালিক নই, তবে আল্লাহ যা চান।[৪] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন নিজের কল্যাণের-অকল্যাণের মালিক নিজে নন, তাহলে তিনি অন্যদের কল্যাণ-অকল্যাণ কীভাবে সাধন করতে পারেন। এ কথাটাই অন্য একটি আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, আয়াতটি হল— قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا–বলুন, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি বা কল্যাণের মালিক নই।[৫] আয়েশা (ﷺ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, যখন ' وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ –আপনি আপনার সগোত্রীয় নিকট ব্যক্তিদেরকে ভয় দেখান[৬], তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, হে সাফিইয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানরা, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি তোমাদের জন্য কোনো কিছুরই মালিক নই। আমার সম্পদ থেকে তোমাদের যা ইচ্ছা চাও।

গুনাহ মাফ করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলাও ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) এর ওফাতের পূর্বে এরূপ করা যেতো কিন্তু ওফাতের পর এ ধরনের কোনো অবকাশ নেই। মৃত্যুর পর মানুষের সকল কাজ রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটি স্পষ্ট হাদিস রয়েছে।[৭] সূরা নিসার ৬৪ নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ পাক বলেছেন—

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

অর্থ : এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচর করার পর তোমার নিকট আগমন করত, তৎপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত, তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, করুনাময় প্রাপ্ত হত।[৮]

–এ আয়তের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশার সাথে। এ আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর পরও গুনাহ মাফ করানোর জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে তাঁর কাছে আর্জি পেশ করার কথা উল্লেখ নেই। আরবি ভাষার ব্যবহার রীতি অনুযায়ী এখানে إذا ব্যবহার করলে ভবিষ্যৎ কালেও এ প্রক্রিয়াটি কার্যকর থাকত। কিন্তু এখানে إذا ব্যবহার না করে إذ ব্যবহার করায় প্রক্রিয়াটি অতীতকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ, অতীতে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায়, অন্যায় করে যদি কেউ আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়, এবং রাসূলুল্লাহও তাদের জন্য গুনাহ মাফ চান, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহকে তাওবা গ্রহণকারী ও দয়াময় পাবে।

---

[১] - রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দোয়া করে বলেছেন, হে আল্লাহ ! আমার কবরকে আপনি পূজার মূর্তিতে পরিণত করবেন না।

[২] - ইবনে কুদামা : আল মুগনি, ৩/৫৫৯

[৩] - সূরা গাফের : ৬০

[৪] - সূরাতুল আরাফ : ১৮৮

[৫] - সূরা আল জিন্ন : ২১

[৬] - শুয়ারা : ২১৪

[৭] - إذا مات ابن آدم انقطع عمله (মুসলিম : ৪২২৩)

[৮] নিসা : আয়াত : ৬৪

নারীর কবর যিয়ারত নিয়ে বিতর্ক আছে। এক হাদিসে কবর যিয়ারতকারী নারীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অভিসম্পাত করেছেন। এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ইসলামি শরিয়তজ্ঞ ওলামাদের একদল নারীর কবর যিয়ারত, হোক তা রাসূলুল্লাহর কবর, অবৈধ বলেছেন। অপর পক্ষে অন্যদল বলেছেন বৈধ। তাদের মতে কবর যিয়ারত, পূর্বে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই অবৈধ ছিল। পরবর্তীতে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়ে যিয়ারতের অনুমতি দেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।[১] এ অনুমতি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ছিল বলে দাবি করেন তারা। বিতর্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উচিত হবে নারীদের কবর যিয়ারতে না যাওয়া। বিশেষ করে বর্তমান-যুগের সার্বিক পরিবেশ নারীর পক্ষে সহায়ক নয়। বরং ফিতনা ও অনিরাপত্তার আশঙ্কা দিন দিন আরো প্রকট আকার ধারণ করছে। তাই নারীদেরকে করব যিয়ারত হতে নিরুৎসাহিত করাই হবে উত্তম। আর অনুমতি প্রদানের হাদিসে নারীদেরকে শামিল করা হয়েছে কি-না, তার পক্ষে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। কেননা নারীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা 'লানত' শব্দ দিয়ে এসেছিল।

তবে কি নারীরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি সালাম পেশ করবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই করবে। তবে তা কবরে গিয়ে নয়। যে কোনো জায়গা থেকেই করা যায়। হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের ঘর-বাড়ি কবরে পরিণত করো না। আর আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করো না। আমার জন্য তোমরা দরুদ পাঠ করো। তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।[২]

মদিনা শরীফে অন্যান্য যিয়ারতের স্থান : জান্নাতুল বাকি

জান্নাতুল বাকি—আরবিতে বাকিউল গারকাদ—পবিত্র মদিনার একটি কবরস্থান যেখানে, ইমাম মালিক (রহ.) এর কথা মতে, প্রায় দশ হাজার সাহাবা কবরস্থ আছেন। আহলে বাইতের অধিকাংশ সদস্য, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উসমান ইবনে মাজউন, আকীল ইবনে আবি তালিব ও খাদিজা (رضي الله عنها) ও মায়মুনা (رضي الله عنها) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অন্যান্য স্ত্রীগণ, আব্দুর রহমান, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ জলিলুল কদর সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বাকিতে কবরস্থ আছেন। সে হিসেবে তাদেরকে সালাম দেয়া ও তাদের জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে জান্নাতুল বাকিতে যাওয়া শরিয়তসম্মত।

বাকি'তে সমাহিত মুমিনগণের প্রতি সালাম দেয়ার সুন্নত তরিকা হলো অনির্দিষ্টভাবে সবাইকে একসাথে সালাম দেয়া ও তাদের জন্য দোয়া করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আহলে বাকি'র যিয়ারতকালে বলতেন।

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الغَرْقَدِ.

–'আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, মুমিন সম্প্রদায়ের আবাস স্থল। আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত হব ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ আপনি আহলে বাকিদেরকে মাফ করে দিন।'

বুরায়দা (رضي الله عنه) এর বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, 'কবর যিয়ারতে গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে শিখাতেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলতেন :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ العَافِيَةَ.

–আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে অত্র জায়গায় বসবাসকারী মুমিন-মুসলিমগণ। আমরা (আপনাদের সাথে) যুক্ত হব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ কামনা করি।[৩]

উল্লেখিত হাদিসসমূহে বাকিতে সমাহিত মুমিনগণকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এর অতিরিক্ত কিছু করতে যাওয়া সুন্নতের খেলাফ; যেমন প্রত্যেকের কবরে ভিন্ন ভিন্নভাবে সালাম দেয়া– জায়েয থাকলেও– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাদের আমলে এর কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে বাকি'র কবরস্থানে গিয়ে নিজের জন্য দোয়া করারও কোনো উদাহরণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাদের জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করা বরং শরিয়ত বহির্ভূত একটি কাজ যা সালাফে সালেহীনদের কেউ করেননি। কবরবাসীদের ওসিলা বানিয়ে দোয়া করা—অর্থাৎ এরূপ বলা যে হে আল্লাহ জান্নাতুল বাকিতে শায়িত বুজুর্গ ব্যক্তিদের উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও–মারাত্মক ধরনের অপরাধ। তাই বাকিতে আবেগতাড়িত হয়ে কখনো এরূপ করবেন না। যেটুকুর অনুমতি হাদিসে আছে সে-টুকু করেই ক্ষান্ত হবেন। এতেই কল্যাণ ও বরকত রয়েছে।

মসজিদে কুবায় সালাত আদায়

---

[১] - كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تزهد في الدنيا و تذكر بالآخرة . (ইবনে মাজাহ : ১৫৬০)

[২] -عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৭৪৬

[৩] - মুসলিম : হাদিস নং ৯৭৫

একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে মসজিদে কোবা। পবিত্র মদিনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ, মসজিদে কোবা। আল্লাহ পাক স্বয়ং এ মসজিদের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন ও এতে যারা সালাত আদায় করতেন তাদের প্রশংসা করেছেন। এরশাদ হয়েছে—

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ.

–নিশ্চয়ই একটি মসজিদ যা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রথম দিন থেকেই, অধিক হকদার যে আপনি তাতে (সালাত আদায় করতে) দাঁড়াবেন। এতে রয়েছে এমন ব্যক্তিগণ যারা পবিত্রতা অর্জনকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।[১] আয়েশা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনি আমর ইবনে আওফ গোত্রে দশ দিনের অধিক সময় অতিবাহিত করলেন। তিনি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি নির্মাণ করলেন, ও তাতে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি আরোহণের জন্তুতে উঠে বসলেন। তিনি চলতে লাগলেন, লোকজনও তাঁর সাথে চলতে লাগল। একসময় উট মসজিদে নববির কাছে বসে পড়ল।[২] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (ﷺ) প্রতি শনিবার, পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে, মসজিদে কোবায় আসতেন।[৩] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণে ইবনে ওমর নিজেও অনুরূপ করতেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর মসজিদে কোবায় এল, এবং তাতে সালাত আদায় করল, এতে তার উমরার মতো ছোয়াব হল।[৪] উমামা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বের হয়ে এই মসজিদে এল, ও তাতে সালাত আদায় করল, সে এক উমরার সমপরিমাণ ছোয়াব পেল।'[৫]

মসজিদে কোবায় সালাত আদায়ের নিয়ম

মসজিদে কোবায় গিয়ে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দেবেন। মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়বেন–

بِسْمِ اللهِ، والصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ[৬].

মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করবেন। এ সালাতের আলাদা কোনো নিয়ত নেই। কেবল মনে মনে স্থির করবেন, আমি দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করছি। সালাত শেষ হলে মসজিদ হতে বের হওয়ার দোয়া পড়ে বাঁ পা আগে দিয়ে বের হয়ে যাবেন। এখানে অন্য কোনো আমল নেই।

যিয়ারতে শুহাদায়ে উহুদ

হিজরি দ্বিতীয় সালে উহুদযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন হামযা (رضي الله عنه) সহ তাঁদের অনেকেই উহুদ প্রান্তরেই শায়িত আছেন। তাদের কবর যিয়ারত করা শরিয়তসম্মত। যিয়ারতের উদ্দেশ্য তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা। জান্নাতুল বাকি যিয়ারতের সময় যে দোয়া পড়তে হয় সে দোয়া পড়েই যিয়ারত করবেন। যে কোনো দিন শুহাদায়ে উহুদের যিয়ারত করা যেতে পারে। বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার নির্দিষ্ট করার বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই।

উল্লেখিত জায়গাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য জায়গা যিয়ারতের কোনো বিধান নেই। সুন্নত অথবা মুস্তাহাব মনে করে যদি কেউ সেসব জায়গা যিয়ারত করতে যায় তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা বেদআত হবে। হাঁ যদি কেবলই দেখার উদ্দেশ্য হয়, ছোয়াব ইবাদত ও বরকত অর্জনের কোনো নিয়ত না থাকে, তবে কোনো অসুবিধা নেই। মদিনার কিছু কূপ রয়েছে যেগুলোর পানি তাবারুক হিসেবে নিয়ে আসার ব্যাপারে যে একটি কথা আছে তারও কোনো ভিত্তি নেই। কেননা সাহাবায়ে কেরামের কেউই দূরদূরান্তে যাওয়ার সময় কোনো পানি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। নিরাময়ের মাটিও সঙ্গে নেয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

বাড়ি প্রত্যাবর্তনের আদব প্রসঙ্গ

বাড়ি প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নতের যথাযথ পায়রবি করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে দ্বীনকে স্বচ্ছ-শুভ্র আকারে রেখে গেছেন তা প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি প্রয়োগের মনোবৃত্তি নিয়ে, কখনো কোনো কাজে যেন সুন্নতে রাসূল পরিত্যাগ না হয় সে ধরনের মানসিকতা নিয়ে মদিনা থেকে দেশে ফিরে আসবেন। দেশে ফেরার পূর্বে মসজিদে নববিতে দু'রাকাত বিদায়ি সালাত আদায় করা শরিয়তসম্মত নয়। হাদিসে ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মে এ ধরনের কোনো

---

[১] - সূরা তাওবা : ১০৮

[২] - فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى ، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله (বোখারি : হাদিস নং ৩৯০৬)

[৩] - বোখারি : হাদিস নং ১১৯৩

[৪] - ইবনে মাজাহ : ১৪০২

[৫] -من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء ، فصلى فيه كان له عدل عمرة (নাসায়ী : ২/৩৭)

[৬] - ইবনু মাজাহ : হাদিস নং (৭৭১) আলবানী এ হাদিসটি বিশুদ্ধ বলেছেন (দ্রঃ সহিহু সুনানি ইবনি মাজাহ ১/১২৮)

সালাত পাওয়া যায় না। বিদায়ি যিয়ারত বলতেও কোনো কিছু নেই। বিদায়ের পূর্বে রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়ে সালাম নিবেদন করে দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনের জন্য, হজ ও যিয়ারত কবুল এবং নিরাপদে দেশে ফেরার জন্য দোয়া করার ব্যাপারে কোনো কোনো বইয়ে যে পরামর্শ আছে তারও কোনো ভিত্তি নেই।

সফর থেকে ফেরার পর নিজ মহল্লা বা শহর দৃষ্টিগোচর হলে,

آئِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

–প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী—এই দোয়া পড়বেন।[১] মহল্লার মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করবেন।[২]

এলাকাবসীর করণীয়

ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে—তুমি যখন হাজির সাথে সাক্ষাৎ করবে তাঁকে সালাম দেবে, তাঁর সাথে মুসাফা করবে, ও তাঁকে তোমার গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলবে, তার ঘরে প্রবেশের পূর্বেই। কেননা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।[৩]

---

[১] - মুসলিম : হাদিস নং ১৩৪২

[২] -أن رسول الله كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين - রাসূলুল্লাহ (স) যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তিনি মসজিদ দিয়ে শুরু করতেন, তিনি সেখানে দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন (মুসলিম: হাদিস নং ২৭৬৯)

[৩] আহমদ : ৫১১৬

হজ পালনকালে যেসব ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ থেকে ভিন্ন

হজ অবস্থায় নারীর পোশাক পরিচ্ছদ

এহরামের ক্ষেত্রে নারীর আলাদা কোনো পোশাক নেই। শালীন ও ঢিলে-ঢালা পর্দা বজায় থাকে এ ধরনের যে কোনো পোশাক পরে নারী এহরাম বাঁধতে পারে। এহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরা ও মাথা আবৃত করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হলেও নারীর জন্য নিষিদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইবনে আব্দিল বার ইমামদের ইজমা– ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

তবে এহরাম অবস্থায় নিকাব বা অনুরূপ কোনো পরিচ্ছদ দিয়ে চেহারা ঢাকা বৈধ নয়। হাদিসে এসেছে, 'নারী যেন নেকাব না লাগায় ও হাতমোজা না পরে।[২] তবে এর অর্থ এ নয় যে বেগানা পুরুষের সামনেও নারী তার চেহারা খোলা রাখবে, এ ক্ষেত্রে ওলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে মাথার উপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে নারীগণ বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করবে।[৩] এ ব্যাপারে আয়েশা (ﷺ) থেকে একটি বর্ণনা ওপরে উল্লেখিত হয়েছে।

হজের সফরে নারীর সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা প্রসঙ্গ

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের মতে নারীকে যদি সফরের দূরত্বে গিয়ে হজ করতে হয় তবে মাহরাম সাথে থাকা শর্ত। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'মাহরাম ব্যতীত কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে যেন একা না হয়। এবং নারী যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী আমার সাথে হজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, আর আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,'যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ কর।[৪] অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যেন তিন দিনের দূরত্বে সফর না করে।[৫] ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : 'নারী যেন মাহরাম ব্যতীত কখনোই হজ না করে।'[৬]

নারীর তালবিয়া পাঠ

তালবিয়া হজের স্লোগান। নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই তালবিয়া পাঠের গুরুত্ব সমান। পার্থক্য এতটুকু যে নারী পুরুষের মত উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বে না। নিজে শুনতে পারে ও পাশে-থাকা সঙ্গিনী শুনতে পারে এতটুকু উচ্চারণে নারী তালবিয়া পাঠ করবে। প্রখ্যাত তাবেয়ি আতা বলেন, 'পুরুষ স্বর উঁচু করে তালবিয়া পড়বে। তবে নারী শুধু নিজেকেই শোনাবে এবং আওয়াজ উঁচু করবে না। ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন, নারীরা স্বর উচ্চ করে তালবিয়া পাঠ করবে না।[৭]

হজ পালনকালে হায়েযরতা নারীর করণীয়

হজ পালনকালে কোনো নারীর হায়েয এসে গেলে তার দুটি অবস্থা:

এক. তাওয়াফে যিয়ারত—হজের ফরজ তাওয়াফ—সম্পাদনের পর হায়েয শুরু হলে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে হায়েযের কারণে তাকে আর বিদায়ি তাওয়াফ করতে হবে না।[৮] আয়েশা (ﷺ) এর হাদিসে এসেছে, উম্মুল মুমিনিন সাফিইয়া (ﷺ) এর হায়েয চলে এলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি (হায়েযের কারণে) আমাদের যাত্রা-বিরতি করাবে ? সাহাবগণ বললেন, তিনি তো ইতোমধ্যে তাওয়াফে যিয়ারত সেরে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাহলে যাত্রা-বিরতির দরকার নেই।[৯]

---

[১] - দেখুন , ইবনুল মুনযির : আল ইজমা , পৃ :১৮, ইবনু আব্দিল বার : আত্তামহীদ , পৃ :১৫-১০৪

[২] - لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (বোখারি : হাদিস নং)

[৩] - ইবনু আব্দিল বার: আত্তামহীদ, ১৫/১০৮

[৪] - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها ذومحرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك (বোখারি ও মুসলিম : ২৩৯১)

[৫] -(لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم)মুসলিম : ২৩৮১

[৬] - সাঈদ আব্দুল কাদের : আলমুগনী ফি ফিকহিল হজ্জ ওয়াল উমরা, পৃ: ২২

[৭] -সাঈদ আব্দুল কাদের : প্রাগুক্ত , পৃ:৮৭

[৮] - দেখুন : সাঈদ আব্দুল কাদের : প্রাগুক্ত , পৃ ৯৯৫

[৯] - বোখারি : ১৬৩৮, মুসলিম : ২৩৫৩

দুই. তাওয়াফে যিয়ারত সম্পাদনের পূর্বে হায়েয চলে এলে সর্বসম্মতিক্রমে দু কাজের যেকোনো একটি করা যাবে:

১. হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তিনি মক্কায় থাকবেন। মাহরামও তার সাথে থেকে যাবে। পবিত্র হলে তিনি তাওয়াফ সেরে নেবেন।

২. খরচের টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে, কিংবা অন্য কোনো কারণে মক্কায় থাকা সম্ভব না হলে দেশে ফিরে যাবেন। তবে তাওয়াফের এ ফরজটি তার ওপর থেকে যাবে। পরবর্তীতে ফিরে এসে তাওয়াফ সেরে নিতে হবে। এ তাওয়াফ সম্পাদনের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মিলন বৈধ হবে না। আর যদি পরবর্তীতে ফিরে আসার আদৌ কোনো সম্ভাবনা না থাকে, এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করাও সম্ভব না হয় তবে বিজ্ঞ ওলামাদের মতানুসারে হায়েয নিঃসৃত হওয়ার জায়গা ন্যাপকিন দিয়ে ভাল করে বেঁধে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পাদন করে নেয়ার অনুমতি আছে। তবে একেবারেই অপারগ না হলে এরূপ করা উচিত নয়।

নারীর তাওয়াফ-সাঈ

নারী, পুরুষের সাথে মিশ্রিত হয়ে তাওয়াফ করবে না। বরং একপাশ হয়ে দূর দিয়ে তাওয়াফ করবে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শের জন্য পুরুষের ভিড়ে যাবে না। যে তাওয়াফে পুরুষকে রামল ইযতিবা করতে হয় সেখানে নারীকে রামল ইযতিবা করতে হবে না।[১]

সাঈ করার সময় নারীকে সবুজ দুই বাতির মাঝে দৌড়াতে হবে না। স্বাভাবিকভাবে চলতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় এবং সাফা মারওয়া সাঈর সময় নারীদের ওপর রামল করার কোনো নির্দেশ নেই।[২]

১

২ - দেখুন: খালেসুল জুমান, ২০৬

হজকারীর ভুলত্রুটি

হজ পালনকালে অনেকেই ভুলত্রুটি করে থাকেন। নীচে উল্লেখযোগ্য কিছু ভুল তুলে ধরা হল।

ক. মীকাত ও এহরাম বিষয়ক ভুল

১. হজ কিংবা উমরার নিয়ত থাকা সত্ত্বেও এহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করা।

২. এহরামের কাপড় পরিধান করার পর থেকে ইযতিবা করা, ও তাওয়াফ শেষে ইযতিবা অবস্থাতেই দু'রাকাত সালাত আদায় করা। ইযতিবা অর্থ চাদরের দু'প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর রেখে দিয়ে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা।

৩. উমরার নিয়তের সময় اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ও হজরে নিয়তের সময় اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني উচিত নয়। কেননা এ ধরনের কোনো নিয়ত হাদিসে উল্লেখিত হয়নি। উমরার নিয়তের সময় لبيك عمرة ও হজের নিয়তের لبيك حجا বলাই সঠিক।

খ. তালবিয়া পাঠের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি

১. অনেকে দলবদ্ধভাবে একই স্বরে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন। পূর্বে একজন বলেন পরে সবাই সমস্বরে বলেন। এরূপ করা ভুল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাগণ এভাবে তালবিয়া পাঠ করেননি। তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তেন।

২. অশুদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ। তালবিয়া হজের স্লোগান হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই অশুদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করেন। এটা ঠিক নয় বরং গুরুত্ব দিয়ে তালবিয়া মুখস্থ করতে হবে ও বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে হবে।

গ. হেরেম শরীফে প্রবেশের সময় ভুলত্রুটি

১. হেরেম শরীফে প্রবেশের সময় অনেক হাজি এমন কিছু দোয়া পাঠ করে থাকেন যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি। অথচ সংগত হল মাসনুন দোয়া পাঠ করা।

২. মসজিদুল হারামের নির্দিষ্ট একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করা অনেকেই জরুরি মনে করেন। এটা ঠিক নয়, বরং যে কোনো দরজা দিয়েই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা চলে।

ঘ. তাওয়াফের সময় ভুলত্রুটি

১. তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য বিশেষ কোনো দোয়া নির্দিষ্ট করা ও তা পড়া।

২. তাওয়াফের সময় একজন নেতৃত্ব দিয়ে উচ্চ স্বরে দোয়া পড়া ও অন্যরা সমস্বরে তার অনুকরণ করা।

৩. অনেকেই মনে করেন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন না করলে হজ অশুদ্ধ হবে, এ ধারণা ঠিক নয়। বরং ভিড় না থাকার হালতে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন-স্পর্শ করা সুন্নত। পক্ষান্তরে ভিড়ের সময় কেবল ইশারা করাই সুন্নত।

৪. কেউ কেউ রুকনে য়ামেনিকে চুম্বন করে থাকে। এটা শুদ্ধ নয়। বরং সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ডান হাত দিয়ে রুকনে য়ামেনিকে স্পর্শ করা ও স্পর্শের পর হাতে চুম্বন না করা। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে, এ ক্ষেত্রে, হাতে ইশারা করার কোনো বিধান নেই।

৫. তাওয়াফের সময় কেউ কেউ কাবার দেয়াল স্পর্শ করেন অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনি ছাড়া আর কিছু স্পর্শ করেনি।

৬. তাওয়াফের সময় কেউ কেউ হাতীমের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে থাকে। এরূপ করলে তাওয়াফ হবে না। কেননা হাতীম পবিত্র কাবার অংশ হিসেবে বিবেচিত।

৭. অনেক হাজি তাওয়াফের সময় সাত চক্করেই রামল করেন এরূপ করা উচিত নয়। কেননা নিয়ম হল কেবল প্রথম তিন চক্করে রামল করা, আর বাকি চক্করগুলোতে স্বাভাবিকভাবে চলা।

৮. তাওয়াফের সময় অনেকেই মাকামে ইব্রাহীমিকে হাত অথবা রুমাল-টুপি দিয়ে স্পর্শ করে থাকে, এরূপ করা মারাত্মক ভুল।

৯. বিদায়ি তাওয়াফের পর পবিত্র কাবার সম্মানার্থে উল্টো হেঁটে বের হওয়া সংগত নয়। কেননা এরূপ করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হয়নি।

১০. অনেকের ধারণা–মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে ছাড়া মসজিদের অন্য কোথাও তাওয়াফের দু'রাকাত সালাত আদায় করা যাবে না। এ ধারণা সঠিক নয়।

সাঈ করার সময় ভুলত্রুটি

১. সাঈর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে পড়া।

২. মারওয়া পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করা।

৩. সাফা পাহাড়ে উঠে সালাতের তাকবিরের ন্যায় দু'হাত উঠিয়ে ইশারা করা। শুদ্ধ হল দু'হাত তুলে শুধু দোয়া করা।

৪. কেউ কেউ মনে করেন, সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে এলে সাঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়। এ ধারণা ভুল। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলেই বরং এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

৫. সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত সাঈ করার পুরো সময়টাতে দ্রুত চলা ভুল। সাঈর সময় দ্রুত চলতে হবে কেবল সবুজ দুই চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে।

৬. কেউ কেউ সাঈ করার সময়ও ইযতিবা করে থাকে। এটা ভুল। ইযতিবা কেবল তাওয়াফে কুদুমের সময় করতে হয়।

৭. পুরুষদের জন্য সবুজ চিহ্নের মাঝে সাঈ তথা দৌড়ে না চলা।

৮. সাঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা দোয়া নির্ধারণ করা।

ঙ. হলক কিংবা কসরের সময় ভুলত্রুটি

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথা পরিব্যাপ্ত না করা। কেউ কেউ একাধিক উমরা আদায়ের লক্ষ্যে এরূপ করে থাকে যা খেলাফে সুন্নত ও ভুল।

সাঈর পর বাসায় গিয়ে স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরে হলক-কসর করা। অথচ নিয়ম হল এহরামের কাপড় গায়ে থাকা অবস্থায় হলক-কসর করা।

চ. ৮ জিলহজ হাজিদের ভুলত্রুটি

৮ তারিখে মিনাতে না এসে সরাসরি আরাফায় চলে যাওয়া।

পুরুষের ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ না করা।

১. মিনাতে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মিনার বাইরে অবস্থান করা।

ছ. আরাফা দিবসের ভুলত্রুটি

১. আরাফার সীমানায় প্রবেশ না করেই উকুফ করা এবং সূর্যাস্তের পর মুযদালেফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

আরাফা মনে করে মসজিদে নামিরার সম্মুখ ভাগে উকুফ করা। অথচ এ অংশটি আরাফার সীমানার বাইরে।

জাবালে আরাফায়—যাকে লোকেরা জাবালে রহমত বলে—যাওয়াকে তাৎপর্যপূর্ণ ও বরকতময় মনে করা এবং সেখান থেকে বরকতের আশায় পাথর সংগ্রহ করা।

কিবলাকে পেছনে রেখে জাবালে আরাফার দিকে মুখ করে দোয়া করা।

২. সূর্যাস্তের পূর্বেই মুযদালেফার উদ্দেশ্যে আরাফা থেকে বের হয়ে যাওয়া।

জ. উকুফে মুযদালেফার ভুলত্রুটি

ধীর-স্থির ও শান্ত ভাব বজায় না রেখে হুলস্থুল করে মুযদালেফার পথে রওয়ানা হওয়া।

মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বে পথেই মাগরিব এশা আদায় করে নেয়া। সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির আযকারের মাধ্যমে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা। মুযদালিফায় উকুফ না করে তা অতিক্রম করে মিনায় চলে যাওয়া।

১. সূর্যোদয় কিংবা তারও পর পর্যন্ত মুযদালেফার উকুফকে প্রলম্বিত করা। কেননা রাসূল (ﷺ) সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

ঝ. কঙ্কর নিক্ষেপের ভুল-ত্রুটি।

মুযদালেফা থেকে কঙ্কর কুড়িয়ে না নিলে কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা। জামরাতে শয়তান রয়েছে মনে করে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় উত্তেজিত হয়ে নিক্ষেপ করা। স্তম্ভের গায়ে কঙ্কর না লাগলে কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা। বরং হাউজের মধ্যে যেকোনো জায়গায় পড়লেই কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে। মুস্তাহাব মনে করে কঙ্কর ধুয়ে পরিষ্কার করা। নিজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ভিড়ের ভয়ে অন্যকে দিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করানো। ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে কঙ্কর

মারা। প্রতি জামারাতে ৭ টির বেশি কঙ্কর মারা এবং প্রতিদিন দুই কিংবা তিনবার করে কঙ্কর মারা। প্রথম ও মাধ্যম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করার জন্য না দাঁড়ানো। ৭ টি কঙ্কর একবার মুষ্টিবদ্ধ করে নিক্ষেপ করা।

অন্যান্য ভুলত্রুটি

আইয়ামে তাশরীকে মিনায় অবস্থান না করা।

১. হারাম সীমানার বাইরে 'হাদী' জবেহ করা। কুরবানির জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাই না করে কুরবানি করা।

২. কুরবানি করার পর নিজে না খেয়ে এবং ফকির মিসকিনকে না দিয়ে ফেলে দেয়া। ঈদের দিনের আগে কুরবানি করা।

৩. কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ শেষ করার পূর্বেই বিদায়ি তাওয়াফ সম্পন্ন করা এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করে সরাসরি নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া। বিদায়ি তাওয়াফের পর যাত্রার ব্যস্ততা ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা। বিদায়ি তাওয়াফের পর কাবার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানানো। কিংবা কাবাকে সামনে রেখে উল্টো হেঁটে মসজিদ থেকে বের হওয়া।

মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারতকালে ভুলত্রুটি

মদিনা যিয়ারত হজের অংশ বলে মনে করা।

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কবর যিয়ারতকালে কবরের চারপাশের দেয়াল বা লোহার জানালাগুলো স্পর্শ করা, চুম্বন করা এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে জানালায় সূতা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা।

২. অভাব পূরণের জন্য কিংবা বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য রাসূল (ﷺ) এর কাছে দোয়া করা। কোনো কিছুর জন্য দোয়া কেবল মহান আল্লাহর কাছেই করার বিধান রয়েছে।

৩. মসজিদে নববির ভেতর রাসূল (ﷺ) এর মিহরাব ও উসমানী মিহরাবে দু'রাকাত সালাত আদায় করা, ও একে বরকতময় মনে করা।

৪. মসজিদে নববির দেয়াল, রাসূল (ﷺ) এর মিহরাব ও মিম্বার বরকতের উদ্দেশে স্পর্শ করা, কিংবা এতে চুম্বন করা।

৫. উহুদ পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় যাওয়া এবং তাবারুক লাভের আশায় ছেঁড়া কাপড় বা নেকরা বাঁধা এবং সেখানে এমন-সব কাজ করা যাতে আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুমতি নেই।

৬. এ ধারণা পোষণ করে কিছু স্থানের যিয়ারত করা যে, এগুলো রাসূল (ﷺ) এর নিদর্শন। যেমন উষ্ট্রীর বসার স্থান, আংটি কূপ(যে কূপে রাসূল (ﷺ) এর আংটি পড়ে গিয়েছিল) অথবা উসমান (رضي الله عنه) এর কূপ। আর বরকত লাভের আশায় এ সমস্ত স্থান হতে মাটি সংগ্রহ করা।

৭. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কবরের পাশে গিয়ে উচ্চস্বরে দোয়া পাঠ করা এবং এ ধারণা করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করতে থাকা যে, এ স্থান দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান। মসজিদে নববিতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সালাত আদায় ওয়াজিব মনে করা। বাকি কবরস্থান ও উহুদের শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারতকালে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের আহ্বান করা এবং কল্যাণ-বরকত লাভের আশায় যেখানে টাকা পয়সা নিক্ষেপ করা।

৮. সাত মসজিদ নামক স্থানে গিয়ে ফজিলত লাভের উদ্দেশে প্রত্যেকটি মসজিদে দু'রাকাত করে সালাত আদায় করা। মদিনায় থাকাকালীন সময়ে খালি পায়ে চলা এ বিশ্বাসে যে মদিনায় জুতা পরিধান করা উচিত নয়।

হজ কবুল হওয়ার আলামত

১. ইমান ও আমলে দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া। পার্থিবতা ও দুনিয়া-সংগ্ন বিষয়-আশয়ের প্রতি অনীহা ও পরকালের প্রতি প্রবল আগ্রহ-লোভ সৃষ্টি হওয়া।

২. হজ-পূর্ব জীবনে যেসব পাপ ও অন্যায়ের সংলগ্নতায় জীবযাপন করতে অভ্যসস্ত ছিল সেগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত হয়ে জীবনযাপন করতে শুরু করা।

৩. হজ সম্পাদনের পর কৃত আমলকে অল্প মনে করা। কেননা মানুষ যত আমলই করুক না-কেন আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের তুলনায় তা নিতান্তই তুচ্ছ। এ কারণেই মুখলিস বান্দাদের গুনাবলীর একটি হল, তারা নিজেদের আমলকে সবসময়ই ছোট মনে করেন। অহংকার ও বড়োত্ব বোধ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইবাদত পালনে উৎসাহ ও চাঞ্চল্যে কখনও যেন ঘাটতি না আসে সে জন্যই এরূপ অত্যাশ্যক।

৪. আমল কবুল না হওয়ার ভয় করা: সাহাবায়ে কেরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) আমল কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে খুবই শঙ্কিত থাকতেন। তাদের প্রসঙ্গেই পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

আর যারা যা দান করে, যা তাদের দেওয়া হয়েছে তা থেকে ভীত, কম্পিত হৃদয়ে- এই বোধে যে, তারা তাদের পালন কর্তার কাছে ফিরে যাবে।[১] নবী করিম (ﷺ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: তারা সিয়াম, সালাত ও সদকা আদায় করে এবং এই ভয় করে যে, না জানি এগুলো কবুল হচ্ছে কি-না।

৫. আশা রাখা ও অধিক পরিমাণে দোয়া করা: ভয় ও শঙ্কার পাশা-পাশী ইবাদত কবুল বিষয়ে আশায় বুক বাঁধতে হয়। কেননা আশারহিত ভয় নৈরাশ্য ডেকে আনতে বাধ্য। ইব্রাহীম ও ইসমাইল (عليهما السلام) কা'বা-গৃহ নির্মাণ করে দোয়ায় মশগুল হয়েছেন। এরশাদ হয়েছে:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কা'বা-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলেন। (তারা দোয়া করলেন) হে পরওয়ারদেগার আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, ও অতি জ্ঞানী।[২]

৬. অধিক পরিমাণে ক্ষমা চাওয়া: কেননা আমল পূর্ণাঙ্গরূপে আদায়ের করার যতোই চেষ্টা-সাধনা করা হোক না-কেন কোথাও না কোথাও ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এ ধরনের ত্রুটি থেকে আমলকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য ইবাদতের পর ইস্তিগফার (কৃত অন্যায় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা) করার নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে হজের কর্মধারা উল্লেখপূর্বক এরশাদ হয়েছে:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অতঃপর তোমরা তাওয়াফের জন্যে দ্রুত গতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আর আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়।[৩] এমনকী স্বয়ং রাসূল (ﷺ) ফরজ সালাত শেষ করে তিনবার আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন ও বলতেন- আস্তাগফিরুল্লাহ।

৭. অধিক পরিমাণে নেক আমল করা: কারণ নেক আমল একটি বৃক্ষের ন্যায় যার গোড়ায় পানি সেচ দেয়া জরুরি যাতে তা বৃদ্ধি পেয়ে ফল দেয়। কোন একটি নেক আমল কবুল হওয়ার আলমত হল অনুরূপ নেক আমলের ধারাবাহিকতা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ ও উদ্যোগ সৃষ্টি হওয়া। কেননা একটি নেক আমল অন্য আরেকটির দিকে টেনে নেয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের নেক আমল সমূহ কবুল করুক।

---

[১] - সূরা মুমিনুন : ৬০
[২] - সূরা বাকারা : ১২৭
[৩] - সূরা বাকারা : ১৯৯

আল-কুরআনের নির্বাচিত দোয়া

١ – رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

(১) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।[১]

٢ – رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

(২) হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে, আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।[২]

٣ – رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

(৩) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল কর। (৪০) হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন। (৪১)[৩]

٤ – رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾

(৪) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দিন (৮৩) আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী (বিখ্যাত) করুন। (৮৪) এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (৮৫) এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থান দিবসে। (৮৭)[৪]

٥ – رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾

(৫) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আপনারই উপর নির্ভর করছি, আপনারই অভীমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনারই নিকট। (৪)[৫]

٦ – رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾

(৬) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৬]

٧ – رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

(৭) হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৫) এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন। (২৬) আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। (২৭) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৮)[৭]

٨ –رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

(৮) হে আমার প্রভু! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি; অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন।[৮]

٩ – رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

---

[১] সূরা- আ'রাফ ২৩
[২] সূরা নূহ : ২৮
[৩] সূরা-ইব্রাহীম : ৪০-৪১
[৪] সূরা-শুআ'রা : ৮৩-৮৭
[৫] সূরা-মুমতাহিনা : ৪
[৬] সূরা-মুমতাহিনা : ৫
[৭] সূরা- ত্বা-হা : ২৫-২৭
[৮] সূরা-আল-ইমরান : ৫৩

(৯) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না। (৮৫) আমাদেরকে তোমার নিজ রহমতে এই কাফেরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন।[১]

١٠- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

(১০) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আমাদের অপরাধ ও আমাদের অপচয়সমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের চরণসমূহ সুদৃঢ় করুন এবং অবিশ্বাসীদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।[২]

١١- رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

(১১) হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রে 'দয়ালু। (১১৮)[৩]

١٢- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

(১২) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা।[৪]

١٣- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

(১৩) হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করনা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করনা। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর।[৫]

١٤- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

(১৪) হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘন প্রবণ করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। [সূরা-আল-ইমরান: ৮]

١٥- رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

(১৫) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ,(৬৫) নিশ্চয় উহা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট। (৬৬) [সূরা-ফুরকান]

١٦- رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

(১৬) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকিদের জন্য অনুসরণযোগ্য। [সূরা-ফুরকান:৭৪]

١٧- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

(১৭) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। [সূরা-হাশর: ১০]

١٨-رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

(১৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৬]

١٩-رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

(১৯) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব হতে রক্ষা কর।[৭]

---

[১] সূরা-ইউনুস : ৮৬
[২] সূরা-আল-ইমরান : ১৪৭
[৩] সূরা- মুমিনুন : ১১৮
[৪] সূরা-বাকারা : ২০১
[৫] সূরা-বাকারা : ২৮৬
[৬] সূরা-তাহরীম : ৮
[৭] সূরা-আল-ইমরান : ১৬

٢٠-رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

(২০) হে আমার প্রতিপালক! এ-নগরীকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রাখ।[১]

٢١-رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

(২১) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।[২]

٢٢- حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

(২২) আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট,তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।[৩]

[১] সুরা-ইব্রাহীম : ৩৫

[২] সূরা আরাফ : ৪৭

[৩] সূরা- তাওবা : ১২৯

হাদিসের নির্বাচিত দোয়া

١ - اَللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتَكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي إِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِين.

(১) হে আল্লাহ, দৃষ্টির অন্তরালবর্তী ও দৃষ্টিগ্রাহ্য সকল বিষয়ে যেন তোমাকে ভয় করতে পারি হে আল্লাহ, যদি জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখ, আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আমাকে মৃত্যু দান কর। সেই তাওফিক প্রার্থনা করি। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফিক, খুশি ও ক্রোধ উভয় অবস্থাতেই। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মিতব্যয়িতার, সচ্ছল-অসচ্ছল উভয়াবস্থায়। প্রার্থনা করি এমন নেয়ামত যা শেষ হবার নয়। প্রার্থনা করি যা চক্ষু জুড়াবে অনিঃশেষভাবে। আমি তোমার নিকট চাই তকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি। আমি তোমার নিকট চাই মৃত্যুর পর সুখময় জীবন। আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমাকে দেখার তৃপ্তি, আমি কামনা করি তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহ-ব্যাকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোন অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবে না এমন কোন ফেৎনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভূষিত কর আর আমাদেরকে বানাও পথ প্রদর্শক ও হেদায়েতের পথিক।[১]

٢-اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

(২) হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রভু তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা এবং আমি আমার সাধ্য-মত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি। আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনাহ-খাতা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন আর কেউ গুনাহ মার্জনাকারী নেই।[২]

٣-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلّ أَوْ أُزَلّ، أَوْ أَضِلّ أو أُضَلّ، أَوْ أَظلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَل أَوْ يُجْهَل عَلَيَّ.

(৩) হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন অথবা পদস্খলিত হওয়া থেকে। পথ হারিয়ে ফেলা অথবা অন্য কর্তৃক পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে। কারও উপর জুলুম করা থেকে অথবা কারো নির্যাতিত হওয়া থেকে। কারও সাথে মূর্খতা-পূর্ণ আচরণ করা থেকে অথবা অন্যের মূর্খতা-জনিত আচরণে আক্রান্ত হওয়া থেকে।[৩]

٤-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، ، وَرِزْقاً طَيِّباً. ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

(৪) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা, গ্রহণযোগ্য আমল এবং পবিত্র জীবিকা প্রার্থনা করি।[৪]

٥-اَللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

(৫) হে আল্লাহ! তোমার জিকির, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার কাজে আমাকে সহায়তা কর।[৫]

٦-لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(৬) আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা বাধা দেয়ার কেহই নেই, আর তুমি যা

[১] নাসায়ি : ৫৪/৩
[২] বোখারি : ৫৮৩১
[৩] নাসায়ি : ৫৩৯১
[৪] ইবনে মাজা : ৯১৫
[৫] হাকিম : ৪৯৯/১

দেবে না তা দেয়ার মত কেহ নেই। তোমার গজব হতে কোন বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না।[১]

٧-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(৭) হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে। আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম পর্যায় থেকে। দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আজাব হতে।[২]

٨-اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

(৮) হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি আর তুমি ছাড়া গুনাহ্সমূহ কেহই মাফ করতে পারে না। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুনে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম কর। তুমি তো মার্জনাকারী ও দয়ালু।[৩]

٩-اَللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالبُخْلِ، والْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا. اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.

(৯) হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া প্রদান কর, তাকে পবিত্র কর। তুমি তার উত্তম পবিত্রকারী, তার অভিভাবক ও মনিব।[৪]

١٠-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

(১০) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি গোপন ব্যাপারগুলো আচ্ছাদিত করে রাখো। ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হতে, পশ্চাতের বিপদ হতে, ডানের বিপদ হতে, বামের বিপদ হতে আর উর্ধ্ব দেশের গজব হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হতে।[৫]

١١-اَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اَللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ.

(১১) হে আল্লাহ! তুমি ঈমানকে আমাদের নিকট সুপ্রিয় করে দাও, এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দাও। কুফর, অবাধ্যতা ও পাপাচারকে আমাদের অন্তরে ঘৃণিত করে দাও, আর আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও। আমাদের মুসলমান হিসেবে বাঁচিয়ে রাখ। লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত না করে আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত কর।[৬]

١٢-اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(১২) হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের আকাঙ্ক্ষী আমি। সুতরাং এক পলের জন্যও তুমি আমাকে আমার নিজের আমার নিজের উপর ছেড়ে দিয়ো না। তুমি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দাও। তুমি ভিন্ন প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই।[৭]

١٣-لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

(১৩) আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, যিনি সহনশীল, মহীয়ান। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, যিনি সুমহান আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। তিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, জমিনের প্রতিপালক এবং সুমহান আরশের প্রতিপালক।[৮]

١٤-اَللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

---

[১] বোখারি : ৭৯৯
[২] বোখারি : ৫৮৮৮
[৩] বোখারি : ৫৮৫১
[৪] মুসলিম : ২০৮৮/৪
[৫] আবু দাউদ : ৪৪১২
[৬] আহমদ : ১৪৯৪৫
[৭] আবু দাউদ : ৪৪২৬
[৮] আহমদ : ৩২৮৬

(১৪) হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কিছু নেই। তুমি প্রকাশ্য, তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই; তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও, আমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করে সম্পদশালী বানাও।[১]

١٥-اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ.

(১৫) হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর নূর। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্যই। তুমি আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর রক্ষক। সকল প্রশংসা তোমার, তুমি আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর প্রতিপালক। তুমি সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার বাণী সত্য। তোমার দর্শন লাভ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবিগণ সত্য। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য। কেয়ামত সত্য।[২]

١٦-اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَاأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(১৬) হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তোমার উপর ভরসা করলাম। তোমার প্রতি ঈমান আনলাম। তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তোমাকে কেন্দ্র করে বিবাদে লিপ্ত হলাম। তোমার নিকট বিচার ফয়সালা সোপর্দ করলাম। অতঃপর আমাকে ক্ষমা কর, যা আগে করেছি এবং যা পরে করব, যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা গোপনে করেছি। তুমিই আমার মা'বুদ। তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই।[৩]

١٧-اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

(১৭) হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল বস্তু দিয়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও। এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুমি ভিন্ন অন্য সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।[৪]

١٨-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

(১৮) হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আজাব হতে, কবরের আজাব হতে, মসিহ দজ্জালের ফিতনা হতে এবং জীবন মৃত্যুর ফেনা হতে।[৫]

١٩-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

(১৯) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমি সাক্ষ্য দিই যে- তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তুমি একক অদ্বিতীয়। সকল কিছুই যার মুখাপেক্ষী। যিনি জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন নাই এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই।[৬]

٢٠-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

(২০) হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, নিয়তির অমঙ্গল, দুর্ভাগ্যের স্পর্শ ও বিপদে শত্রুর উপহাস হতে।[৭]

٢١-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلاَقِ.

(২১) হে আল্লাহ! আমি সকল বিরোধ, মুনাফেকি এবং বদ চরিত্র হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৮]

٢٢-اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

(২২) হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ।[১]

---

[১] মুসলিম : ৪৮৮৮
[২] বোখারি : ৫৮৪২
[৩] বোখারি : ৫৮৪৩
[৪] তিরমিজি : ৩৪৮৬
[৫] মুসলিম : ৯৩০
[৬] তিরমিজি : ৩৩৯৭
[৭] বোখারি : ৫৮৭১
[৮] বোখারি : ৫৩৭৬

٢٣-اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

(২৩) হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছ, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত কর। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, আমাকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছ তা হতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারণ কর। তোমার উপরে তো কেউ ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, সে কোন দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছ, সে কখনো সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।[২]

٢٤- اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ إِلٰهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(২৪) হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তোমার প্রতি ঈমান আনলাম। তোমার উপর ভরসা করলাম। তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তোমার উদ্দেশ্যে বিবাদে লিপ্ত হলাম। তোমার নিকট বিচার ফয়সালার ভার সোপর্দ করলাম। অতঃপর তুমি আমাকে ক্ষমা কর, যা আগে করেছি ও পরে করব, যা প্রকাশ্যে করেছি ও যা গোপনে করেছি। এবং যে বিষয়ে আমার থেকেও তুমি অধিক অবহিত আছ। তুমিই আমার মা'বুদ। তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই।[৩]

٢٥-اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا ، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا ، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا ، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

(২৫) হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তর আলোকময় কর। আমার কর্ণ আলোকময় কর। আমার চোখ জ্যোতির্ময় কর। আমার সম্মুখ আলোকময় কর। আমার পশ্চাৎ আলোকময় কর। আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে জ্যোতি ছড়িয়ে দাও। আমার নূরকে তুমি বৃহদাকার করে দাও। হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।[৪]

٢٦-اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(২৬) হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের আকাঙ্ক্ষী আমি, সুতরাং তুমি এক পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিয়ো না। তুমি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দাও। তুমি ভিন্ন প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই।[৫]

٢٧-اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ بَصَرِي ، وَجِلاَءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي.

(২৭) হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দির পুত্র। আমার ভাগ্য তোমারই হাতে। আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর। আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ। আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে, যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ, অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে যে নাম শিখিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই-তুমি কুরআন মাজিদকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারীতে পরিণত কর।[৬]

٢٨-يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

(২৮) হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! তোমার দ্বীনের উপর আমার অন্তরকে অবিচল রাখ।[৭]

٢٩-اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

(২৯) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণময় সকল বিষয় কামনা করি, কল্যাণের আগত ও অনাগত বিষয়গুলো; যা আমি জানতে পেরেছি এবং যা আমি জানতে পারিনি। আর আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি সকল প্রকার অনিষ্ট হতে, অনিষ্টের আগত ও অনাগত সকল বিষয় হতে, যা আমি জানতে পেরেছি এবং যা আমি জানতে পারিনি।[৮]

---

[১] মুসলিম : ৭৪৫
[২] তিরমিজি : ৪২৬
[৩] বোখারি : ৫৮৪২
[৪] মুসলিম : ১২৭৯
[৫] আবু দাউদ : ৪৪২৬
[৬] আহমদ : ৩৫২৮
[৭] তিরমিজি : ৩৪৪৪
[৮] ইবনে মাজা : ৩৮৩৬

٣٠-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ ، وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَقَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ.

(৩০) হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি অসার জ্ঞান হতে, অশ্রুত দো'আ হতে, এবং এমন প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন অন্তর হতে যা বিগলিত হয় না।[১]

٣١-اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ.

(৩১) হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সকল ঘৃণিত স্বভাব, অবাঞ্ছিত আচরণ, কুপ্রবৃত্তির তাড়না ও রোগ-ব্যাধি হতে দূরে রাখ।[২]

٣٢-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالْعَفَافَ ، وَالْغِنَى، وَالْعَمَلَ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى.

(৩২) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা, সম্পদের প্রাচুর্য এবং সে কাজ করার সামর্থ্য কামনা করি যা তুমি পছন্দ কর ও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।[৩]

٣٣-اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَاعِدًا ، وَلاَ تُطِعْ فِيَّ عَدُوًّا وَلاَ حَاسِدًا.

(৩৩) হে আল্লাহ! আমাকে ইসলাম সহকারে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং বসা অবস্থায় তথা সর্বাবস্থায় হেফাজত কর। আমার ক্ষেত্রে আমার কোন শত্রু, আমার কোন নিন্দুক বা হিংসুক খুশি হয়ে উপহাস করতে পারে এমন কোন কাজ করনা।[৪]

٣٤-اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ.

(৩৪) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কামনা করছি সেসব কল্যাণ ও মঙ্গল যার ভাণ্ডার তোমার হাতে। আর তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি সেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে, যার ভাণ্ডারও তোমার হাতে।

٣٥-اللهم آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(৩৫) হে আমাদের রব! তুমি আমাদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল দান কর। আর জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা কর।[৫]

[১] মুসলিম : ৪৮৯৯
[২] তিরমিজি : ৩৫১৫
[৩] মুসলিম : ৪৮৯৮
[৪] সহিহ জামেউস সগীর : ১২৬০
[৫] বোখারি : ১৬৩/৭